জন্মমৃত্যু-রহস্য

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

শ্রীপ্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

দাশগুপ্ত প্রকাশন
সি-১৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

নিবেদন

সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতেই জীবন ও মৃত্যুর রহস্য চিন্তাশীল মানুষকে ভাবাইয়া রাখিয়াছে। এই রহস্যের সন্ধান করিতে গিয়াই যত বেদবেদান্ত ও দর্শনের সৃষ্টি। এই রহস্য উন্মোচন করিতে গিয়াই কত মহাপুরুষের উদ্ভব। তবুও বিশ্বজোড়া ইহার সন্ধান চলিয়াছে—চলিতে থাকবে। কারণ সৃষ্টি যেমন অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত চলিতে থাকিবে, জীবন-মৃত্যুর রহস্যও তেমনি অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। সুবর্ণময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত হইয়া আছে। এই হিরণ্ময় পাত্র কি? উহা কি বিত্তমোহ বা বিষয়বাসনা নয়? সত্য বিষয়বাসনায় ঢাকা পড়িয়া আছে। সুতরাং যাঁহার বিষয়বাসনা দূর হইয়াছে কেবল তিনিই সত্যের দর্শন করিতে পারেন, তিনিই জীবন-মৃত্যুর রহস্য ভেদ করিয়া সত্যের রাজ্যে পৌঁছিতে পারেন।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি বর্তমান গ্রন্থের লেখক সুদীর্ঘদিন শিক্ষা বিভাগে কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও আজ বহু বৎসর গত হইয়াছে। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাত্ত্বিক জীবন গ্রহণ করিয়া সংসার হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া শাস্ত্রাদির অধ্যয়নে ও শাস্ত্রানুশীলনে ব্যাপৃত আছেন। এককথায় তিনি একজন সম্পূর্ণ নিস্পৃহ মানুষ। তাঁহার বিষয়বাসনা একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে কিনা তাহা কেবল অন্তর্যামীই বলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হইবার পর আমি ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—যে-শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রানুমোদিত জীবন থাকিলে জন্মমৃত্যু-রহস্যের মত দুরূহ বিষয়টিকে নূতন আলোকে সর্ব সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করার অধিকারী হওয়া যায় তিনি তাহার সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি।

পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বহু বিষয় নূতন করিয়া জানিতে পারিলাম। বহু জটিল বিষয়ের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পড়িয়া বাস্তবিকই চমৎকৃত হইলাম। পুস্তকখানি পাঠ করিলে জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রই উপকৃত হইবেন একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

বিধুভূষণ দাসগুপ্ত

বিষয়-সূচী

মন্তব্য—জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক এই পাণ্ডুলিপির ১০।১১ নং বিষয়সূচী দেখিয়া প্রকৃতি পুরুষ, দৈব পুরুষকার শব্দ দুই দুইটির মধ্যে "ও" কিংবা "হাইফেন" দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়াছেন অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ, দৈব ও পুরুষকার অথবা প্রকৃতি-পুরুষ, দৈব-পুরুষকার। তাঁহার এই ইঙ্গিত যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু শব্দ দুইটির মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ভাব আছে; "ও" বসাইয়া সেই ভাবকে বিচ্ছিন্ন করা সঙ্গত নহে। পিতা মাতা, ভাই ভগিনী স্বামী স্ত্রী, গুরু শিষ্য প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত আছে।

আর হাইফেন তো বসিতেই পারে না; কারণ তুলনামূলক স্থলেই হাইফেন বসে। যথা—সংসার-সমুদ্র, রহস্য-প্রবাহ, জ্ঞান-পিপাসু, আকাশ-কুসুম, মুখ-পদ্ম ইত্যাদি।

মঙ্গলাচরণ

অখণ্ড মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত চরাচরে।
সে পদ দেখান যিনি নমি গুরুবরে॥
জগৎ গুরু বাসুদেব দেবকী নন্দন।
বন্দি কংস-নিসূদন চানুর মর্দ্দন॥
যাতে পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি বোবা কথা কয়।
বন্দি সে মাধব পদ সদানন্দ ময়॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি যত দেবগণ।
করেন যাঁহার স্তব সদা সর্ব্বক্ষণ॥
যাঁহার মহত্ত্ব গাঁথা বেদোপনিষদে।
রাখেন যোগীরা যাঁরে সমাহিত হৃদে॥
সুরাসুর গণ অন্ত না জানেন যাঁর।
সেই দেবতাকে আমি করি নমস্কার॥

পূর্বাভাষ

সৃষ্টির অনাদি অনন্তকাল অবধি অবিশ্রান্ত ও অবিরাম ধারায় জন্ম-মৃত্যুর রহস্য-প্রবাহ খরস্রোতা তটিনীর ন্যায় প্রবল গতিতে পৃথিবীতে বহিয়া চলিয়াছে দিবারাত্র। এই অপরিসীম কৌতুহল প্রতিটি মানবমনকে উদ্দীপিত করে জানার জন্য। সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ভগবানের নাম স্মরণে রাখিয়া এবং নিজেকে নিমিত্ত মাত্র জ্ঞান করিয়া ঐ অব্যক্ত শক্তি এবং তৎসহ আরও কয়েকটি অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে মূল তথ্যাদি অবহিত হইবার জন্য প্রামাণ্যস্বরূপ নানা শাস্ত্রোক্ত মতবাদ সহ এই 'জন্মমৃত্যু-রহস্য' নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছি। মতবাদগুলি সুপ্রাচীন হইলেও আধুনিক চিন্তাধারাকে সুপ্তাবস্থা হইতে জাগ্রত ও সংশয়জাল ভেদ করিতে সহায়ক হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

মনুষ্যজীবনে একমাত্র অনির্বচনীয় আনন্দলাভই চরম লক্ষ্যবস্তু। এই দেবভোগ্য পার্থিব অপার্থিব উভয়বিধ আনন্দ-সুধা উপভোগ করিতে হইলে "জন্মমৃত্যু-রহস্য" গ্রন্থখানি সময়োপযোগী সহায়ক গ্রন্থরূপে এক অপরিহার্য অমূল্য সম্পদ। যেহেতু, ইহাতে ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের রহস্যময় যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ও অধ্যাত্মতত্ত্বের সুবিস্তৃত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত রহিয়াছে।

যাঁহারা মৃত্যুসমাকুল সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারাও এই গ্রন্থে বেদান্ত তত্ত্বের যথোপযোগী নির্দেশ পাইবেন। আদর্শ চরিত্রগঠনের পক্ষে যে সকল মৌলিক নীতির আবশ্যক, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ নীতিই এই গ্রন্থে গল্পচ্ছলে আলোচিত হইয়াছে। অনেকগুলি অলৌকিক,

চমকপ্রদ ও শিক্ষাপ্রদ আখ্যায়িকার সমাবেশ হেতু গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে—প্রাত্যহিক কর্মানুষ্ঠানে যে সকল রীতিনীতি, আচার আচরণ মানিয়া চলা হয় সেগুলির উৎপত্তি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরিশিষ্ট ভাগে এমন কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা আছে যেগুলি জ্ঞান-পিপাসুদের পক্ষে অভীষ্ট ফলদায়ক হইবে, দুর্বল জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সবল ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে পারিবে।

কোন কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সমাজে প্রচলিত আচার আচরণ বিশেষকে কুসংস্কার (Superstition) ও নিরর্থক মনে করেন। তাঁহাদের ধারণা এগুলি অন্ধবিশ্বাসের ফলস্বরূপ ; কিন্তু কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্যই হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে এই প্রথাগুলির ভিতর কোন না কোন একটা কারণ নিশ্চয়ই অন্তর্নিহিত আছে যাহার দরুণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই নিষ্ঠার সহিত ঐগুলি যথাযথ পালিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহাদের এই অপ্রকৃত ধারণা এই গ্রন্থ পাঠে অপনোদিত হইবে এবং প্রকৃত অর্থ তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ। ভারতীয় পশ্চিমাঞ্চলে বিবাহের সময়ে বরের হাতে ছুরি থাকে, বাংলাদেশে যাঁতি থাকে, অর্থাৎ এই শক্তিস্বরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন করিবে। এইটি বীরভাব।

এই গ্রন্থের আর একটি প্রধান লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, বিষয়াসক্ত মানবমনের বিভিন্ন ভ্রান্তধারণা ও দুরূহ সংশয় সমূহের মূলোচ্ছেদ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব জনসমক্ষে তুলিয়া ধরা। এইরূপ অত্যাবশ্যকীয় বহুবিধ বিষয়ে পরিপুষ্ট, সুখপাঠ্য ও পূর্ণাঙ্গ কলেবর একখানি গ্রন্থ গৃহে থাকিলে আর অধিক অনির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের সন্ধানে পাঠককে চিন্তিত হইতে হইবে না।

এই গ্রন্থোপদিষ্ট অধ্যাত্ম ভাবধারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলে উভয়ত্র নিষ্কণ্টক সুখৈশ্বর্যের উত্তরাধিকারী হইতে কাহাকেও কোন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে না।

মতবাদগুলি ন্যায়ের মতে "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষদিগের উপদেশ প্রামাণ্য এবং তাহারই নাম শব্দ প্রমাণ ; সুতরাং ভ্রম প্রমাদ বিবর্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। অধিকন্তু বিষয়গুলি অধ্যাত্ম বিধায়ক বলিয়া তর্কদ্বারা বোধগম্য নহে।

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনয়া।" (কঠোপনিষদ ১।২।৯)

নিবেদক

গ্রন্থকার।

মৃত্যু-রহস্য

ঃ ১ ঃ

মৃত্যু

ওঁ ধর্ম্মায় ওঁ ধর্ম্মরাজায় ওঁ মৃত্যবে নমো নমঃ।

মৃত্যু, জীবনের সবচেয়ে বড় রহস্য। নিত্য দিনই মানুষ ও জীবজন্তু মারা যাইতেছে কিন্তু তবু মানুষ মৃত্যু বিষয়ে ভাবে না। তার ধারণা, তার কখনও মরণ হইবে না। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্?

(মহাভারতে যুধিষ্ঠির-বাক্য।)

যে বেদনার ভাষা নাই,
যে দুঃখের সান্ত্বনা নাই,
যাহা কখনও পূরণ হয় না,
এবং যাহা অনিবার্য্য—তাহাই মৃত্যু।

প্রাণের সম্পর্ক বা বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া গেলে দেহের উজ্জীবন হয় না, সেই অবস্থাকে মরণ বলা হয়। যখন মরণকাল উপস্থিত হয় তখন জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণবৃত্তি ভূত-সূক্ষ্মে অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহে সপিণ্ডিত হয় অর্থাৎ ডেলার ন্যায় একত্রীভূত হয়। জীব সেই সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন করিয়া সেই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

মরণের সময় দেহ হইতে একপ্রকার সূক্ষ্ম বায়বীয় পদার্থ নির্গত হইয়া

যায় তাহা জ্যোতিষ্মান্। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ব্যতীত কেহই ইহা দেখিতে পায় না। বিজ্ঞানীরা ঐ বস্তুটীর নাম দিয়াছেন এক্‌টোপ্লাজম্ বা সূক্ষ্ম বহিঃ-সত্তা। এর কোন নির্দিষ্ট আকার নাই। এক্‌টোপ্লাজম্ পদার্থটি কম্পন-শীল (vibratory)। সূক্ষ্ম জড়কণা দিয়া গঠিত এবং ঐ সূক্ষ্ম জড়কণা-গুলিই শাশ্বত আত্মার ভিতরের আবরণ ও বাইরের আবরণ জড়দেহ সৃষ্টি করে। সুতরাং দেখা যায়—মানুষের দুইটি দেহ আছে : একটি পার্থিব জড়দেহ এবং অপরটি সূক্ষ্ম বায়বীয় দেহ। এই দুইটি দেহ আমাদের সকলেরই আছে। বেদান্ত আন্তর দেহকেই সূক্ষ্মদেহ বলে এবং বেদান্তের মতে এই সূক্ষ্ম দেহই আত্মার আন্তর আবরণ এবং পার্থিব জড় দেহটি হইল উহার বাহিরের আবরণ।

মানুষের চেতন আত্মা যখন মরণের পর দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন উহার ফটোগ্রাফ লওয়া যায়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম এক ধরণের যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে আমেরিকার গবেষণায়। এই যন্ত্র-বলে মরণের অব্যবহিত পরে দেহকে ওজন করা যায়। ঠিক মৃত্যু-সময়ে দেহ হইতে যে জ্যোতিষ্মান সূক্ষ্ম বায়বীয় পদার্থ নির্গত হইয়া যায়, তাহাকে ঐ আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম যন্ত্রে মাপ করিয়া দেখা গিয়াছে, উহার ওজন প্রায় এক আউন্সের তিন ভাগ।

মৃত্যুতে দেহের পরিবর্তন হয় মাত্র। দেহের তো সত্যিকারের কোন সত্তা নাই, কারণ তাহা সর্বদাই পরিবর্তনশীল। প্রতি সাত বৎসর অন্তর আমাদের দেহের আমূল পরিবর্তন ঘটিতেছে। তাহা হইলেও আমরা কিন্তু বাঁচিয়া থাকি। আমাদের সত্তার মধ্যে কোথাও কোন বিচ্ছেদ ঘটে না, আমাদের স্মরণশক্তিও ঠিক থাকে। শৈশব হইতে কৈশোরে, কৈশোর হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ়তায়, প্রৌঢ়তা হইতে জরায় কেবলই পরিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে।

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা" ইত্যাদি

(গীতা ২।১৩)

আত্মা অমর, অ-বিকারী, সর্বগত, অচ্ছেদ্য ইত্যাদি (গীতা ২।২৩)

নশ্বর দেহের বিনাশের সহিত আত্মার বিনাশ হয় না। পার্থিব বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আত্মা এক দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণ করে ; এই কারণে জীবের মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ঘটে। মরণের পরে জীবাত্মা তাহার সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করিয়া পরলোকের দেশে যায় বিশ্রাম পাইবে বলিয়া। সেখানে কিন্তু বাসনার বৃশ্চিক দংশনে সে এতটুকুও বিশ্রাম পায় না, পায় না শান্তি। শান্তির আশায় সে ফিরিয়া আসে আবার এই পৃথিবীর বুকেই ; কিন্তু সেখানে তাহার জীবনে মিলে না শান্তি। তাই আবার সে ফিরিয়া যায় পরলোকের দেশে। অবিশ্রান্ত এই যাতায়াতের খেলাই চলিতে থাকে তাহার আশা-প্রতিহত জীবনে।

ক্রোধেও মানুষের মৃত্যু হইতে পারে। ডাঃ জন হাণ্টার নামে একজন প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন মনের শক্তিতে। তবে মনের ক্রিয়াকে তিনি সংযত করিতে পারিতেন না ; ক্রোধ চাপিয়া রাখার শক্তি তাঁহার ছিল না। একবার সামান্য কারণে তাঁহার ক্রোধ হয়, উহার ফলে তিনি মারা যান। ক্রোধ যে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে তাহার ঐতিহাসিক উদাহরণ আছে। ফরাসী চিকিৎসক টুরটেল (Tourtelle) দুইটি মহিলাকে দেখিয়া ছিলেন, তাঁহারা ক্রোধের দরুণ মারা যান।

অতিশয় ক্রোধে মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। অল্প ক্রোধেও মানুষের খুব খারাপ রোগ হইতে পারে। মা যদি ক্রোধ অবস্থায় শিশুকে মাই দেয় তো তাহার ফল বিষময় হয়। সে ক্রোধ শিশুর সারা দেহ-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইহা বহু পরীক্ষিত সত্য।

ক্রোধ যেমন উহার নাশক শক্তি দিয়াই দেহমনের ক্ষতি করে ও অনর্থ বাধায়, ভয়ও তেমনি। একটি প্রবাদ আছে—"আমরা ভয়ে মরিয়া যাই"—

ইহার পিছনে অর্থ আছে। অতিরিক্ত ভয়ে মানুষের মরণ হইতে পারে ; হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। শোকও দেহ মনের অনেক অপকার করিতে পারে।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ (গীতা ২।২৭)

অর্থাৎ যে জন্মায় তাহার মৃত্যু নিশ্চিত, এবং যে মরে তাহার জন্মও নিশ্চিত।

"জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে!
চিরস্থির কবে নীর হায় রে, জীবন-নদে ?" (মাইকেল)

রাত্রির প্রারম্ভে তমোগুণের প্রাধান্য ; মৃত্যুতেও তাহাই হয় ; আবার রাত্রিতে যেমন ঐন্দ্রিয়িক সমস্ত ক্রিয়া নিস্তব্ধ হয় এবং রাত্রি শেষে ক্রমে আবার সমস্ত ক্রিয়া ফুটিয়া উঠে, মৃত্যুতেও তাহাই হয়। মৃত্যুর সময়ে সমস্ত ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে। ঐ অবস্থায় কিছুদিন থাকিয়া ক্রমে সমস্ত শক্তিই ক্রিয়োন্মুখী হয়, তাই আবার জন্ম হয়। প্রলয়ের সঙ্গে মৃত্যুর এইটুকুই পার্থক্য—প্রলয়ে একেবারে অ-ক্রিয়াবস্থা কিন্তু মৃত্যুতে তাহা হয় না। কিছুকাল পরেই লিঙ্গ শরীরে অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহে ক্রিয়া আরম্ভ হয়। (শ্রীশ্রীচণ্ডী)

জীবন যদি দীপশিখার মতো নিভিয়া যায়, সেই জীবনের জন্য এত সংগ্রাম কেন ? এত দুঃখ কষ্ট কেন উহার জন্য ভোগ করা ? স্থূলদেহ লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি সব সত্তাই লোপ পায়, তবে মানুষ ধর্ম্মজীবন যাপন, নৈতিক জীবন অনুশীলন করে কেন ? প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করিয়া তাহাদের সবকিছু অপহরণ করে না কেন ?

প্রত্যেক লোকই তাহা হইলে পুরাদস্তুর স্বার্থপর হইয়া উঠিত। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা চরিত্র-গঠন আর দরকারী বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে এ যাবৎ মানব সমাজ যেসব কৃষ্টি ও

শিল্পনীতির মূল্যবোধ নিরূপণ করিয়াছেন সকলই নষ্ট হইয়া যাইবে। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি যে সাধারণ স্বার্থগন্ধহীন মমতা ও ভালবাসা আছে, তাহাও প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হইবে। আর তাহা হইলে কি আমরা এই বিশ্বসংসারে উদ্দেশ্যবিহীন ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীন খেলাই খেলিয়া যাইব! না, তাহা কখনো হইতে পারে না। কেননা তাহাই যদি হয়, তবে সাংসারিক জঞ্জালস্বরূপ দুঃখ কষ্ট এড়াইবার জন্য আমাদের আত্মহত্যা করিতে হয়; ধর্মশাস্ত্রগুলি সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ ও দেবদেবীর মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া ধূলিসাৎ করিতে হয়। তখন সাধারণ পশুর মতো ইন্দ্রিয়ের জগতে আমাদের ঘুরিয়া বেড়াইয়া কাল কাটাইতে হইবে।

আর আত্মা যদি শাশ্বত ও অমর নাই হয়, তবে ধর্মজীবন যাপন কিংবা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদান করারই বা যৌক্তিকতা কোথায়?

> ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
> নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ।
> যাবজ্জীবেৎ সুখম্ জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
> ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?
>
> (সর্বদর্শন-সংগ্রহে বৃহস্পতি-বাক্য।)

অর্থাৎ নাস্তিক্যবাদী ও জড়বস্তুবাদী লোকেরা যাঁহারা দেহের অবসানের পর আত্মার যে অস্তিত্ব আছে সেকথা অস্বীকার করিতেন তাঁহাদের বলা হইত চার্বাক, তাঁহাদের মতে দেহই আত্মা। দেহ ছাড়া আত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই, দেহের মরণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিলুপ্তি ঘটে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এমন কোন বস্তুকে তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহাদের নীতি ছিল—"যতদিন বাঁচিবে ভোগ করিয়া লও। সুখে, আরামে, বাঁচিয়া জীবনের আনন্দ-সুধা উপভোগ করিয়া যাও। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা মূঢ়তা মাত্র। তোমার যাহা দরকার তাহা যেমন করিয়া হউক যোগাড় কর; অর্থ নাই, ঋণ কর, না হয় ভিক্ষা করিয়া অন্ন জুটাইয়া লও। মরণের

পর কোন কাজের জন্য কেহ দায়ী হইবে না"; তবে আর ভাবনা কিসের?

যেমন দিন যায় ও রাত্রি আসে, তেমনি জন্মের পর মরণ আসে এবং আবার জন্ম হয়। পৃথিবীর মাটী কোন দিনই মানুষের শাশ্বত বাসস্থান নহে, আলেয়ার (apparition) মতোই তাহার সত্তা থাকে চিরদিন। মাত্র কিছুদিনের জন্যই মানুষের জ্ঞান-চক্ষুকে তাহা আবৃত করে। মাতাপিতার আর্তনাদ, সন্তানের কাতর ক্রন্দন, বিধবার অশ্রুপাত, অর্থের প্রলোভন, ইহাদের কোনটার দিকেই নির্ম্মম মৃত্যু দৃষ্টিপাত করে না কোন দিন। তাই মৃত্যুকে জীবাত্মার বিশ্রাম বলা হয়। মৃত্যু—পরিবর্ত্তন বা অবস্থার বিবর্ত্তন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

পাপপুণ্য ভুলিয়া যাওয়ার একটা পথ থাকা চাই। ইহ জীবনের বেদনা যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখন এইগুলি বিস্মরণ হওয়ার দরকার। তাই ভগবান মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মৃত্যুর অর্থ দীর্ঘ নিদ্রা। দিনের কাজের পর ৭।৮ ঘণ্টা আমরা ঘুমাই; সেই নিদ্রাকে কি আমরা ভয় করি? অপর দিকে, যদি ঘুম না আসে তো আমরা ভাবনায় প'ড়ি। নিদ্রা যেমন দরকার, মৃত্যুও তেমন দরকার। ঘুম হইতে উঠিয়া আমরা আবার কাজ আরম্ভ করি, তদ্রূপ মৃত্যুর পরে পূর্ব্বেকার সকল সাধনা আমাদের কাজে আসিবে। পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস আমাদিগকে পরজন্মে টানিয়া আনিবে।

জীবনের অন্তে মরণকালে দেহের সকল দিক্ হইতে বিনাশ হয়, দেহ জরাজীর্ণ হয়। কিন্তু ভিতরের আসল বস্তুটি (আত্মা) লেশমাত্রও বিকৃত হয় না। সে সর্বাঙ্গে পূর্ণ থাকে, নীরোগ ও অবিকৃত থাকে।

'দেহই আমি' এই ভাব সর্ব্বত্র বিস্তার হইতেছে, তাহার ফলে মানুষ কিছুমাত্র বিচার না করিয়া দেহের তুষ্টি-পুষ্টির জন্য নানাবিধ সাধন প্রস্তুত করিয়া লইতেছে। তাহা দেখিয়া বড় ভয় হয়; দেহ প্রাচীন

হইয়াছে, জীর্ণ হইয়াছে তবুও যেকোন প্রকারে উহা টিকাইয়া রাখিতে হইবে ; ইহাই লোকের অনুক্ষণের চিন্তা। কিন্তু এই দেহ, এই খোসা কতদিন আপনি টিকাইয়া রাখিবেন? বড়জোর মৃত্যু পর্যন্ত। যম যখন শিয়রে দাঁড়াইবে, ক্ষণকালও তখন এই দেহ রক্ষা করা যাইবে না। মৃত্যুর পরে সকল গরিমা একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

আত্মিক জীবনে ত্যাগ, তিতিক্ষা, তপস্যা ও সিদ্ধির গুণে মানুষ অতি দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে। আড়াই শত বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনে কঠোর তপশ্চর্য্যার ফলে ত্রৈলিঙ্গস্বামী অর্জ্জন করেন অপরিমেয় যোগ-বিভূতি। এই যোগ-বিভূতি বলে তিনি এই দীর্ঘ আড়াই শত বৎসর জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১২৯৪ সনের পৌষ মাসে শুক্লা একাদশীর পুণ্য তিথিতে বারাণসীর ঘাটে মহাযোগীর অমরাত্মার উৎক্রমণ ঘটে। সাধারণতঃ এত দীর্ঘকাল মানুষের আয়ুষ্কাল হয় না।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনের প্রতি মানুষের মমতা এত বেশী যে, মৃত্যুর করাল গ্রাসকেও সে অনায়াসে উপেক্ষা করে এবং দেহকেই যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে, দেহাতিরিক্ত আর কোন জিনিষ নাই বলিয়া তাহার ধারণা হয়।

"হায় দেহ—নাই তুমি ছাড়া কেহ—
জানি আমি প্রাণে প্রাণে
মুরতি পাগল, মনের মমতা
তাই ধায় তোমা পানে।" (মোহিত লাল, মৃত্যুশোকে)

আমরা সংসারে আশার আশ্রয় লইয়া জীবনযাপন করি এবং অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও উহার পরিচর্য্যায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি। কিন্তু—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়
তাই ভাবি মনে—
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে?

দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একি দায়!" (মাইকেল)

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতম্ তুণ্ডম্।
করধৃত-কম্পিত-শোভিত-দণ্ডং তথাপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডম্॥
(মোহমুদ্গর)

শরীর গলিছে, চুল মাথায় পাকিছে,
দন্তগুলি একে একে খসিয়া পড়িছে,
কাঁপিছে সাধের ছড়ি, হাতে অনুক্ষণ,
আশাভাণ্ড তবু লোক না ছাড়ে কখন।

পূর্বে এক ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে এক দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ বন সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ ও নিশাচরগণে সমাকীর্ণ ও ভীষণ শব্দে পরিপূরিত ছিল। উহা এত ভয়ঙ্কর যে, দর্শন করিবামাত্র কৃতান্তকেও ভীত হইতে হয়। সেই ভীষণ অরণ্য দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে উদ্বেগ উপস্থিত হইল এবং সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তখন তিনি "কাহার শরণাপন্ন হইব" এই ভাবিয়া দশদিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণভয়ে ধাবমান হইলেন। ঐ কাননে সুদৃঢ় বৃক্ষলতাদি মণ্ডিত একটি বৃহৎ কূপ বিদ্যমান ছিল। দ্বিজবর উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে সেই গভীরকূপে নিপতিত ও লতাজালে লগ্ন হইয়া উর্দ্ধপাদে অধোমস্তকে বৃন্ত-সংলগ্ন পনস (কাঁটাল) ফলের ন্যায় লম্বমান রহিলেন। কূপ মধ্যে লম্বমান হইয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এমন নহে; ঐস্থানেও তাঁহার অন্য এক উপদ্রব উপস্থিত হইল। তিনি তথায় সেই অবস্থায় দেখিলেন যে, একটা বিষধর সর্প ঐ কূপের গাত্রে অবস্থিত রহিয়াছে। বৃক্ষস্থিত মৌচাক হইতে মধুক্ষরণ হইতেছিল। ঐ সঙ্কট সময়েও ব্রাহ্মণ সতত সেই মধুধারা পান করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইল না। বরং উত্তরোত্তর তাঁহার অধিক লাভের প্রত্যাশা বলবতী হইতে লাগিল। তখন

ঐ অবস্থাতেও তাঁহার জীবনে বিন্দুমাত্র বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য উপস্থিত হইল না।

জীব সর্বপ্রথমে গর্ভ মধ্যে গাঢ় রক্তে লীন থাকে। পরে পঞ্চম মাস গত হইলে, সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইয়া মাংস-শোণিত-লিপ্ত অতি অপবিত্র স্থানে বাস করে। পরিশেষে বায়ু-প্রভাবে ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া যোনিদ্বারে আগমন ও বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া তথা হইতে মুক্ত হয়; এইরূপে প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয় পাশে আবদ্ধ হইতে থাকে। তখন অন্যান্য বিবিধ উপদ্রব তাহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। মাংসলোভী কুক্কুরের ন্যায় গ্রহ সমুদয় তাহার সন্নিধানে সমাগত হয়। ব্যাধি কর্ম্মদোষে তাহার শরীরে প্রবেশ করে এবং অন্যান্য বিপদ্ তাহাকে নিপীড়িত করিতে থাকে। মনুষ্য বাল্যকালে এই প্রকার বিবিধ ক্লেশে পরিক্লিষ্ট হইয়া কোন ক্রমেই তৃপ্তিলাভ করিতে সক্ষম হয় না। তৎকালে তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরাই তাহাকে রক্ষা করে। ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে যে যমলোক গমনের সময় সমুপস্থিত হইতেছে, তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যমদূত তাহাকে যথাকালে আকর্ষণ পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে। 'পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।' সংসারের কি বিচিত্র গতি!

লোকে বারংবার আপনি আপনার বিনাশের কারণ হইয়াও আপনাকে উপেক্ষা করে। ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয় প্রভৃতির বশীভূত হইয়া একেবারে আত্মজ্ঞান রহিত হয়। যখন সকলকেই সমভাবে ধরাতলে নিপতিত হইয়া দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হইতে হইবে, তখন বুদ্ধিহীন মানবগণ কি নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিতে বাসনা করে? এই সংসারে ব্যাধি, রূপ-লাবণ্য বিনাশিনী জরা, সর্ব্বসংহারকর্ত্তা প্রাণিগণের অন্তক কাল, আয়ুক্ষয়কর সংবৎসর, ঋতু, মাস, দিবা ও রাত্রি, কাম ও কামরস প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। মানবগণ কামরসে সতত নিমগ্ন হইয়া থাকে; সত্য-দর্শন-শক্তি লাভের

চেষ্টাই করে না। এতৎ সত্ত্বেও বাঁচিয়া থাকার আকাঙ্ক্ষা কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না।

এই মর্ত্যলোকে মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়াও আপনার কার্য্য-প্রভাবে শুভ-লোক সমুদয় দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত মহাভারতে পাওয়া যায়। সেখানে তাহার মৃত্যু সাময়িকভাবে ঘটে, বটে কিন্তু সে মৃত্যু চিরকালের জন্য নহে। পরে পুনরুজ্জীবন সে লাভ করে। (মহাভারত অনুশাসন পর্ব)

নাচিকেতের উপাখ্যান—

পূর্বে তপঃপ্রভাবান্বিত উদ্দালকি নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি নদীতীরে এক নিয়মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম সমাপ্ত হইলে আপনার পুত্র নাচিকেতের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস, আমি স্নানান্তে নিবিষ্টচিত্তে বেদপাঠে আসক্ত হইয়া নদীতীরে কাষ্ঠ, কুশ, পুষ্প, কলস ও ভোজন দ্রব্য সমুদয় বিস্মৃতিবশে রাখিয়া আসিয়াছি ; অতএব তুমি সত্বর তথায় গমন করিয়া তৎসমুদয় আনয়ন কর।" নাচিকেত পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র অবিলম্বে নদীতীরে গমন করিয়া দেখিলেন তাহার পিতা যে সমস্ত দ্রব্য তথায় বিস্মৃত হইয়া ফেলিয়া গিয়াছেন, নদীস্রোত তৎসমুদয় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তখন নাচিকেত পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "পিতঃ, আপনি আমাকে যে সমস্ত দ্রব্য আনয়নার্থ আদেশ করিয়াছিলেন আমি তৎসমুদয় তথায় প্রাপ্ত হইলাম না।" মহর্ষি উদ্দালকি একান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে "তোমার অচিরাৎ যম দর্শন হউক" বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। পিতা এইরূপ বজ্রতুল্য কঠোর বাক্য নিক্ষেপ করিবামাত্র নাচিকেত করজোড়ে "আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এই কথা বলিতে বলিতেই গতায়ু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন মহর্ষি উদ্দালকি পুত্রকে মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া "হায়, আমি কি কুকর্ম্ম

করিলাম” বলিয়া দুঃখাবেশ প্রভাবে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলিত চিত্তে নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; ক্রমে দিবস ও রজনী অতিক্রান্ত হইল।

নাচিকেত এতাবৎ কাল গতাসু হইয়া কুশাসনে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রভাত সময়ে জলসেক প্রভাবে শস্য যেমন সতেজ হয়, সেইরূপ পিতার নয়নযুগল হইতে অবিরল নিপতিত বাষ্পবারি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ পুনর্জীবিত হইয়া নিদ্রাভঙ্গ হইতে উত্থিত ব্যক্তির ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ সময়ে তিনি দুর্বল হইয়াছিলেন ও তাঁহার গাত্র হইতে দিব্যগন্ধ নির্গত হইতেছিল। তখন মহর্ষি উদ্দালকি পুত্রকে পুনঃ প্রত্যাগত দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন, “বৎস, তুমি আপনার কার্য-প্রভাবে তো শুভলোক সমুদয় দর্শন করিয়াছ। তোমার এই দেহ মনুষ্য-দেহ নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার ভাগ্যবলেই তুমি পুনরুজ্জীবিত হইলে।”

মহর্ষি উদ্দালকি এই কথা কহিলে, নাচিকেত অন্যান্য মহর্ষিগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “পিতঃ, আমি আপনার আদেশ প্রতি-পালন করিবার নিমিত্ত যমসদনে উপস্থিত হইয়া যমের সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এক সভা নিরীক্ষণ করিলাম। আমি সেই সভা দর্শন ও তথায় প্রবেশ করিবামাত্র যম আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার উপবেশনার্থ এক আসন আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন এবং আমাকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আমি আসনে উপবিষ্ট এবং কৃতান্তের সদস্যগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও পরিবৃত হইয়া মৃদু বাক্যে যমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, “ধর্ম্মরাজ, আমি আপনার রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে আমি যে লোকের উপযুক্ত, আমাকে তথায় প্রেরণ করুন।” তখন যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে কহিলেন, “ভগবন্, আপনার মৃত্যু হয় নাই

চেষ্টাই করে না। এতৎ সত্ত্বেও বাঁচিয়া থাকার আকাঙ্ক্ষা কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না।

এই মর্ত্যলোকে মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়াও আপনার কার্য্য-প্রভাবে শুভ-লোক সমুদয় দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত মহাভারতে পাওয়া যায়। সেখানে তাহার মৃত্যু সাময়িকভাবে ঘটে, বটে কিন্তু সে মৃত্যু চিরকালের জন্য নহে। পরে পুনরুজ্জীবন সে লাভ করে। (মহাভারত অনুশাসন পর্ব)

নাচিকেতের উপাখ্যান—

পূর্বে তপঃপ্রভাবান্বিত উদ্দালকি নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি নদীতীরে এক নিয়মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই নিয়ম সমাপ্ত হইলে আপনার পুত্র নাচিকেতের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস, আমি স্নানান্তে নিবিষ্টচিত্তে বেদপাঠে আসক্ত হইয়া নদীতীরে কাষ্ঠ, কুশ, পুষ্প, কলস ও ভোজন দ্রব্য সমুদয় বিস্মৃতিবশে রাখিয়া আসিয়াছি ; অতএব তুমি সত্বর তথায় গমন করিয়া তৎসমুদয় আনয়ন কর।" নাচিকেত পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র অবিলম্বে নদীতীরে গমন করিয়া দেখিলেন তাহার পিতা যে সমস্ত দ্রব্য তথায় বিস্মৃত হইয়া ফেলিয়া গিয়াছেন, নদীস্রোত তৎসমুদয় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তখন নাচিকেত পিতার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "পিতঃ, আপনি আমাকে যে সমস্ত দ্রব্য আনয়নার্থ আদেশ করিয়াছিলেন আমি তৎসমুদয় তথায় প্রাপ্ত হইলাম না।" মহর্ষি উদ্দালকি একান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে "তোমার অচিরাৎ যম দর্শন হউক" বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। পিতা এইরূপ বজ্রতুল্য কঠোর বাক্য নিক্ষেপ করিবামাত্র নাচিকেত করজোড়ে "আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এই কথা বলিতে বলিতেই গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন মহর্ষি উদ্দালকি পুত্রকে মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া "হায়, আমি কি কুকর্ম্ম

করিলাম” বলিয়া দুঃখাবেশ প্রভাবে ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলিত চিত্তে নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন ; ক্রমে দিবস ও রজনী অতিক্রান্ত হইল।

নাচিকেত এতাবৎ কাল গতাসু হইয়া কুশাসনে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রভাত সময়ে জলসেক প্রভাবে শস্য যেমন সতেজ হয়, সেইরূপ পিতার নয়নযুগল হইতে অবিরল নিপতিত বাষ্পবারি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ পুনর্জীবিত হইয়া নিদ্রাভঙ্গ হইতে উত্থিত ব্যক্তির ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। ঐ সময়ে তিনি দুর্বল হইয়াছিলেন ও তাঁহার গাত্র হইতে দিব্যগন্ধ নির্গত হইতেছিল। তখন মহর্ষি উদ্দালকি পুত্রকে পুনঃ প্রত্যাগত দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন, “বৎস, তুমি আপনার কার্য-প্রভাবে তো শুভলোক সমুদয় দর্শন করিয়াছ। তোমার এই দেহ মনুষ্য-দেহ নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার ভাগ্যবলেই তুমি পুনরুজ্জীবিত হইলে।”

মহর্ষি উদ্দালকি এই কথা কহিলে, নাচিকেত অন্যান্য মহর্ষিগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “পিতঃ, আমি আপনার আদেশ প্রতি-পালন করিবার নিমিত্ত যমসদনে উপস্থিত হইয়া যমের সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এক সভা নিরীক্ষণ করিলাম। আমি সেই সভা দর্শন ও তথায় প্রবেশ করিবামাত্র যম আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার উপবেশনার্থ এক আসন আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন এবং আমাকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আমি আসনে উপবিষ্ট এবং কৃতান্তের সদস্যগণ কর্তৃক সংস্কৃত ও পরিবৃত হইয়া মৃদু বাক্যে যমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, “ধর্ম্মরাজ, আমি আপনার রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে আমি যে লোকের উপযুক্ত, আমাকে তথায় প্রেরণ করুন।” তখন যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে কহিলেন, “ভগবন্, আপনার মৃত্যু হয় নাই।

আপনার পিতা হুতাশনের স্থায় তেজস্বী। তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া আপনাকে কহিয়াছিলেন, "তোমার অবিলম্বে যমদর্শন হউক।" তাঁহার সেই বাক্য নিরর্থক করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, এই নিমিত্তই এইস্থানে আপনাকে আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমাকে অবলোকন করিলেন, অতঃপর প্রতিগমন করুন। আপনার পিতা আপনার বিরহে অতিশয় শোকাকুল হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। আপনি আমার প্রিয়তম অতিথি; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা করুন. আমি অবশ্যই তাহা সফল করিব।

কৃতান্ত আমাকে এই কথা কহিলে আমি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, "ধর্ম্মরাজ, আমি এক্ষণে আপনার অধিকারে সমুপস্থিত হইয়াছি। এস্থানে আগমন করিলে আর কাহারও প্রতিগমন করিবার ক্ষমতা থাকে না। যাহা হউক, যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাকে পুণ্যোপার্জ্জিত উৎকৃষ্ট লোকসমুদয় প্রদর্শন করান।"

আমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে, যমরাজ আমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র এক অশ্বসংযুক্ত প্রভাসম্পন্ন রথে আমাকে আরোপিত করিয়া পুণ্যোপার্জ্জিত লোকসমুদয়ে গমন করিলেন। আমি তথায় গিয়া দেখিলাম, পুণ্যাত্মাদিগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলের স্থায় শুভ্রবর্ণ কিঙ্কিনী-জড়িত সর্ব্বরত্ন-সংযুক্ত বৈদূর্য্যমণি ও সূর্য্যের স্থায় প্রভাসম্পন্ন অনেক তলযুক্ত নানা প্রকার স্বর্ণ ও রজতময় গৃহ প্রস্তুত রহিয়াছে, ঐ সমুদয় গৃহের অভ্যন্তরে নানাপ্রকার মনোহর বসন, ভোজ্যদ্রব্য প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। আমি ধর্ম্মরাজের অনুগ্রহে অত্যাশ্চর্য্য ও রমণীয় বহুস্থান ও দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। "হে পিতঃ! আপনি আমাকে শাপ প্রদান করাতে আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ প্রদান করা হইয়াছে। আপনি অভিসম্পাত না করিলে আমি কখনই ধর্ম্মরাজ যমকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতাম না।" এই উপাখ্যান পাঠে, মনুষ্য

তপঃপ্রভাবে ও পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে, ইহা বেশ উপলব্ধি হয়।

মৃত্যুর সময়ে মুখে গঙ্গাজল দেওয়ার বিধান আছে। ইহা অতি তাৎপর্যপূর্ণ বিধান। ইহার অর্থ এই যে, সেই সময় আত্মা বহির্গত হইবার জন্য মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখে আবির্ভূত হয়। সেই সময়ে মুখে নিক্ষিপ্ত গঙ্গাজলের দ্বারা আত্মায় যদি কোন কল্মষ (দোষ) থাকে, তবে তাহা ধৌত হইয়া নির্ম্মল হয় এবং দেহান্তরে আত্মার বিকাশ স্বচ্ছ হয়।

"মৃত্যু" অধ্যায়ের সারমর্ম্ম এই যে, জীবলোক সততই জরা দ্বারা অভিভূত ও মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত হইতেছে; জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত স্বল্পকালের মধ্যে অল্প সলিলস্থ মৎস্যের ন্যায় কোন ব্যক্তিই সুখলাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের অভিলাষ, সুসম্পন্ন হইতে না হইতেই মৃত্যু তাহাকে আক্রমণ করে এবং ব্যাঘ্রী যেমন মেষকে লইয়া যায়, সেইরূপ সে বিষয়াসক্তচিত্ত কাম্য কর্মের ফলভোগ-প্রবৃত্ত মনুষ্যকে গ্রহণপূর্বক গমন করিয়া থাকে। অতএব যাহা আপনার শ্রেয়স্কর, তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। তদ্বিষয়ে কালক্ষেপ করা নিতান্ত অনুচিত। মনুষ্যের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে না হইতেই মৃত্যু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং যাহা পরদিনের কার্য্য, তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, এবং যাহা অপরাহ্নে অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা পূর্বাহ্নে-ই সম্পন্ন করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্যের কার্য্য সমাধা হউক বা না হউক, মৃত্যু তাহার প্রতীক্ষা করে না। এবং কোন্ দিন যে মৃত্যু হইবে, তাহাও কেহ অবধারণা করিতে পারে না। মনুষ্যের জীবন অনিত্য, অতএব যৌবন অবস্থাতেই ধর্ম্মানুশীলন করা আবশ্যক। ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সুখলাভ হইয়া থাকে। স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তিই সংসার-বন্ধনের রজ্জু। ধর্ম্মাত্মা লোক সেই রজ্জু ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

সময় উপস্থিত হইলে প্রাণী মাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে না।

ঃ ২ ঃ

সূক্ষ্মশরীর

মৃত্যুসময়ে জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন করিয়া সেই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। সেই সূক্ষ্ম শরীর (Etherial body) সতেরটা উপাদানে গঠিত। পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। সাংখ্য-কার কপিল ও অন্যান্য হিন্দু দার্শনিকগণ সতেরটা উপাদানে গঠিত দেহকে সূক্ষ্ম শরীর বলিয়াছেন। সূক্ষ্মদেহ আমাদের আত্মার যথার্থ স্বরূপ নহে আবরণ মাত্র। মরণের সময় ঐ ভৌতিক সূক্ষ্ম দেহটা শরীর ছাড়িয়া চলিয়া যায়; কিন্তু সেটা চলিয়া গেলেও শরীর ও তাহার ব্যবধানে থাকিয়া যায় বাষ্পীয় আকারে একটী যোগসূত্র; অবশেষে ওটাও গলিয়া যায়। আত্মা বা সূক্ষ্মদেহ থাকে তখন অচেতন অবস্থায়—যেমন মাতৃগর্ভে শিশু থাকে প্রাণ লইয়া, কিন্তু তাহার বাহিরের চেতনা থাকে না। দেহের মৃত্যু হইলেও সংস্কার মরে না। তাই মানুষ মরিয়া গেলেও সমস্ত সংস্কারই সূক্ষ্ম বীজের আকারে মনের মধ্যে থাকে। যেমন বৃক্ষের পরিপূর্ণ রূপটি বর্তমান থাকে বীজের অভ্যন্তরে অদৃশ্য অবস্থায় প্রচ্ছন্ন আকারে। বীজের মধ্যে যাহা থাকে প্রচ্ছন্ন, পারিপার্শ্বিকতার সহায়তায় তাহা পরিণত হয় বাস্তবতায়, পরিণত হয় প্রত্যক্ষীভূত আকারে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা এমন কোন ক্ষমতা দান করে না যাহা আগে হইতে বীজে থাকে না।

সূক্ষ্ম শরীর হইল অদৃশ্য বীজ বা "হৃদবিন্দু"। ইহাতেই থাকে মন, বুদ্ধি, যৌক্তিকতা, চিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদ ও স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-শক্তি। এ সমস্ত শক্তি ছাড়াও সূক্ষ্ম শরীরে থাকে প্রারব্ধ বা পূর্ব্বজন্মের সংস্কার। ব্যোম (Ether) এবং অতি সূক্ষ্ম পদার্থ এক শক্তি দ্বারা কেন্দ্রীভূত হইলে গঠিত হয় সূক্ষ্ম শরীর। এই শক্তিকেই বলা হয় প্রাণ শক্তি বা জীবনী শক্তি।

সূক্ষ্ম শরীরই হইল প্রকৃত মানুষ। ইহা মানুষের আকারে রূপান্তরিত হয় এবং ভোগের জন্য সৃষ্টি করে অবয়বের। সূক্ষ্ম শরীর মানুষের হউক বা পশুরই হউক, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী আকার ধারণ করে। মানুষ মানুষের শরীর ধারণ করে; আবার ঐ ইচ্ছা যদি কোন পশু বিশেষের হয়, তবে গঠন করে সেই পশু-দেহ। সূক্ষ্ম শরীরের বিশেষ কোন আকার থাকে না; যে কোন আকার সে লইতে পারে। আত্মা তাহার কর্ম্ম অনুযায়ী দেহ ধারণ করিতে বাধ্য। এই সূক্ষ্ম শরীরেই প্রাণীর সকল কিছু বর্তমান থাকে; সেই জন্য আমাদের বাহির হইতে কিছুই গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না, সব কিছুই আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে থাকে। তাহার মধ্যে থাকে অনন্ত শক্তি ও অনন্ত সম্ভাবনা। যোগীরা (Devotees) বলিবেন—অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি কিংবা প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা. ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামা-বসায়িতা এই অষ্টসিদ্ধি, যাহা তিনি লাভ করিতে চাহেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে লাভ করিবার নহে, সেই সব পূর্ব হইতেই আত্মাতে বিদ্যমান থাকে, ইহজন্মে নবদেহে ব্যক্ত করিতে হইবে মাত্র।

নিমিত্তং প্রয়োজকং প্রকৃতিনাং বরণভেদস্তু।
ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ। (যোগসূত্র ৪।৩)।

অর্থাৎ কৃষককে যেমন তাহার ক্ষেত্রে জল আনিতে হইলে ক্ষেত্রের আলি ভাঙ্গিয়া দিয়া নিকটস্থ একটি জল-প্রণালীর সহিত উহার যোগ করিয়া দিতে হয়, তাহার পর জল যেমন উহার নিজ বেগে আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি সকল শক্তি, পূর্ণতা, পবিত্রতা যাহা পূর্ব হইতে বিদ্যমান, কেবল মায়ার আবরণের জন্য উহা প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না, সেই মায়াকে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে। একবার এই আবরণ অপসারিত হইলে আত্মা তাঁহার স্বাভাবিক পূর্ণতা, পবিত্রতা প্রভৃতি লাভ করেন এবং তাঁহার সুপ্ত শক্তিসমূহ জাগ্রত হইয়া উঠে।

সুপ্ত বা স্বপ্নাবস্থায় নানাবিধ সুখকর স্বপ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কখন

হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ, কখন স্বর্ণময় রাজসিংহাসনে উপবেশন, কখন বা মৃত প্রিয়জনদের দর্শন ও আলিঙ্গন ইত্যাদি নানাবিধ চিত্তাকর্ষক ও আনন্দময় স্বপ্ন দৃষ্ট হয় এবং সেইগুলি সেই সময়ের জন্য বাস্তব সত্য বলিয়া মনে হয়। সুপ্তি ভঙ্গ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখি, যে শয্যায় শুইয়াছিলাম সেই শয্যায়ই আছি; কোথায় বা সেই সকল সুখপ্রদ দ্রব্য আর কোথায় বা প্রিয়জন! কিন্তু তথাপি সেইসকল স্বপ্ন স্মরণ করিয়া একটা সাময়িক আনন্দ উপভোগ করি।

ইহার কারণ এই যে, আমাদের দেহস্থিত আত্মা স্বল্পক্ষণের জন্য সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া দেহ হইতে বহির্গত হয় এবং অন্য একটী কল্পিত স্থূলদেহ ধারণ করে এবং এই স্থূল দেহেই মন অধিষ্ঠিত থাকায়, সুখদুঃখাদি অনুভব করা যায়। আমাদের অবচেতন মনে গচ্ছিত ভাবরাশি অনুসারে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়। আত্মা বহির্গত হইবার সময় তাঁহার সূক্ষ্ম শরীরের সহিত জড়দেহের একটা যোগসূত্র থাকিয়া যায় এবং এই কারণে জড়দেহের স্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ থাকে। পুনরায় সূক্ষ্ম শরীরস্থ আত্মা পূর্ব-শায়িত দেহে প্রবেশ করে। নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং স্বপ্নও বিলীন হইয়া যায়।

মনুষ্যগণের মরণকালে জীবাত্মা শরীরের যে যে স্থান দ্বারা বহির্গত হইলে যে যে গতি লাভ হয় তাহা এস্থলে বর্ণনা করা হইতেছে :—

১। চরণ দ্বারা নির্গত হইলে বিষ্ণুলোক;

২। জঙ্ঘা (কোমর) দ্বারা নির্গত হইলে অষ্টবসুর লোক;

৩। জানু (হাঁটু) দ্বারা নির্গত হইলে সাধ্যগণের লোক;

৪। পায়ু (মলদ্বার) দ্বারা নির্গত হইলে মৈত্র লোক;

৫। জঘন (নিতম্ব) দ্বারা নির্গত হইলে মনুষ্যলোক;

৬। উরু দ্বারা নির্গত হইলে প্রজাপতি লোক;

৭। পার্শ্ব দ্বারা নির্গত হইলে মরুল্লোক;

৮। নাসা পথ দ্বারা নির্গত হইলে চন্দ্রলোক;

৯। বাহু দ্বারা নির্গত হইলে ইন্দ্রলোক ;
১০। বক্ষঃস্থল দ্বারা নির্গত হইলে রুদ্রলোক ;
১১। গ্রীবা দ্বারা নির্গত হইলে মহর্ষিদিগের লোক ;
১২। মুখ দ্বারা নির্গত হইলে বিশ্বদেবগণের লোক ;
১৩। কর্ণ দ্বারা নির্গত হইলে দিগ্‌দেবতাগণের লোক ;
১৪। ঘ্রাণ দ্বারা নির্গত হইলে বায়ুলোক ;
১৫। নেত্র দ্বারা নির্গত হইলে সূর্য্যলোক ;
১৬। ভ্রূ দ্বারা নির্গত হইলে অশ্বিনীকুমারের লোক ;
১৭। ললাট দ্বারা নির্গত হইলে পিতৃলোক এবং
১৮। ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইলে ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে।

(মহাভারত শান্তি পর্ব)

"পাশবদ্ধো ভবেদ্ জীবঃ, পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।" (শিবসংহিতা) অর্থাৎ আত্মা যখন দেহমধ্যে বন্ধন অবস্থায় বিরাজ করেন, তখন জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, তখন সেই চৈতন্য আত্মার উপাধি জীবপদবাচ্য হইয়া থাকে।

দেহ তিনটি :—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ।

স্থূলদেহ—পাঞ্চভৌতিক দেহই স্থূলদেহ অর্থাৎ পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত দেহ—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ ভূত।

সূক্ষ্মদেহ—সপ্তদশ অবয়ব-দেহই সূক্ষ্মদেহ ; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ও মন এবং বুদ্ধি এই সতেরটা উপাদানে সূক্ষ্মদেহ গঠিত।

কারণ-দেহ—শুভাশুভ কর্ম্মে আত্মা যখন লিপ্ত, সেই অবস্থাটাকে কারণদেহ বলে। শুভাশুভ কার্য্যের কারণে আত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ ধ্বংস হইলেও আত্মা সূক্ষ্ম-দেহে অবস্থান করেন ; সূক্ষ্মদেহ ধ্বংস হইলেও কারণ-দেহে আত্মাকে অবস্থান করিতে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত কারণ-দেহ ধ্বংস না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আত্মার মোচন হয় না। এই ত্রিবিধ উপাধি হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিতে পারিলে আত্মা মুক্ত হয় ; তখন আত্মাকে আর জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।

ঃ ৩ ঃ

পুনর্জন্ম

(আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ—Re-generation)

পুনর্জ্জন্মবাদ প্রাচীন ধর্ম্ম সমূহের একটি পুরাতন বিশ্বাস। ফার্সি, য়িহুদী, খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রথম প্রবর্ত্তকগণের নিকট ইহা সুপরিচিত ছিল। আরবদিগের মধ্যে ইহা একটি প্রচলিত বিশ্বাস ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে ইহা এখনও টিকিয়া আছে। আমরা এই বিশ্বজগতে এক ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী; কিন্তু সংসারের দিকে তাকাইলে ন্যায়ের পরিবর্ত্তে অন্যায়ই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ জন্মিয়া অবধি সুখভোগ করিতেছে—শরীর সুস্থ ও সুন্দর, মন উৎসাহপূর্ণ, কিছুরই অভাব নাই, সকল সুযোগ সুবিধা যেন তাহার হাতের মূঠায় আসিয়া পড়িতেছে। আবার কেহ জন্মিয়া অবধি দুঃখ বোধ করিতেছে—কাহারও হস্ত বা পদ বিকল, কেহ বা অন্ধ, জড়বুদ্ধি এবং অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতেছে, কেহ বা অপরের উপর নির্ভর করিয়া আছে; কেহ বা নৈতিক অধঃপাতে গিয়া সমাজচ্যুত হইয়া পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইতেছে।

যখন সকলেই এক ন্যায়পরায়ণ ও করুণাময় ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট, তখন কেহ সুখী কেহ দুঃখী হইল কেন? ভগবান কেন এত পক্ষপাতী! কিন্তু তিনি সচ্চিদানন্দ, নির্লিপ্ত, শত্রুমিত্র জ্ঞানের অতীত। অতএব স্বীকার করিতে হইবে সুখী বা দুঃখী হইয়া জন্মিবার পূর্ব্বে নিশ্চয় বহুবিধ কারণ ছিল, যাহার ফলে জন্মের পর মানুষ সুখী বা দুঃখী হয়। তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মসমূহই সেই সব কারণ।

জন্মান্তরবাদ এই গরমিলগুলির সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে।

এই মতবাদ আমাদিগকে দুর্নীতিপরায়ণ না করিয়া ন্যায়ের ধারণায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। মানুষের ভিতর সুখ-দুঃখের এত তারতম্য কেন—ইহার উত্তরে হয়ত অনেকে বলিবে ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু ইহা আদৌ সদুত্তর নহে। ইহা অ-বৈজ্ঞানিক। প্রত্যেক ঘটনারই একটা না একটা কারণ থাকিবেই। একমাত্র ঈশ্বরকেই সকল কার্য্য-কারণের বিধাতা বলিলে তিনি এক ভীষণ দুর্নীতিশীল ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হন; কিন্তু তাহা নহে। তিনি নির্গুণ, ভেদাভেদ বর্জিত।

আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি, ইহা কি আমাদের প্রথম আসা? ইহা কি আমাদের প্রথম জন্ম?

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি নত্বং বেত্থ পরন্তপ।" (গীতা ৪।৫)।

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, আমার ও তোমার অনেক বার জন্ম হইয়াছে। এই সকল আমি জানি, তুমি জান না।

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" (গীঃ ৭।১৯)

অর্থাৎ অনেক জন্মের পর লোক জ্ঞানবান হয় এবং আমাকে অনুভব করিতে পারে।

বেদ বলেন—আমি দেহমধ্যস্থ আত্মা, আমি দেহ নহি। দেহ মরিবে কিন্তু আমি মরিব না। দেহ মরিলেও আমি তখনও বাঁচিয়া থাকিব এবং আমি পূর্ব্বেও ছিলাম। সৃষ্টি বলিতে শূন্য হইতে কোন জিনিষ আকস্মিকভাবে উৎপন্ন হওয়া বুঝায় না। সৃষ্টি শব্দের অর্থ—বিভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ; ভবিষ্যতে এইগুলি নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন হইবে। অতএব আত্মা যদি সৃষ্ট পদার্থ হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা মরণশীলও বটে; কিন্তু আত্মা অজর, অমর। সুতরাং আত্মা সৃষ্ট পদার্থ নন। মনুষ্যদেহে জন্মগ্রহণ করিবার আগে আমাদের আত্মার অস্তিত্ব ছিল। অতএব বলা উচিত—সৃষ্টি নহে, বিকাশ।

জীবাত্মা যখন কোন একটি কাজ শেষ করে বা নির্দিষ্ট কোন সুখের চরম অবস্থা অনুভব করে বা তাহার বাসনা সম্পূর্ণ চরিতার্থ করে, তখন তাহার বহিরাবরণ দেহটা আর ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যকরী হয় না অর্থাৎ যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগে না বা তাহার কোন উপযোগিতা থাকে না; আর তখনই সে তাহার জীর্ণ অকেজো জড়দেহ পরিত্যাগ করে ও কাজের উপযোগী নূতন একটা দেহ ধারণ করে। যে প্রকার মনুষ্য পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে অথবা গৃহী যেমন পুরাতন জীর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করে, আত্মা সেইরূপ পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন কলেবর ধারণ করে।

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৫।১৬)

পুনর্জ্জন্মবাদ বিবর্ত্তনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সূক্ষ্ম প্রাণবীজ (আত্মা) কতকগুলি বাসনা চরিতার্থ ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও উচ্চতর অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এবং সেই সঙ্গে কর্ম্মাকর্ম্মের ফলস্বরূপ দেহধারণ করিতে বাধ্য। ইহাতে তাহার খুসীমত প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। জন্মাইবার আগে আত্মা তাহার মন ও ভাবের অনুযায়ী মাতাপিতা, পরিবেশ ও আবেষ্টনী নির্ব্বাচন করে। জীবাত্মা আবার জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু যতক্ষণ না জন্মের অনুকূল পরিবেশ দেখিতে পায়, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করে না। মানবীয় আত্মা পশুদেহ ধারণ করে না। বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম অনুযায়ী সে মানবীয় স্তরেই থাকে; তাহাকে নীচে নামিতে হয় না। চেতনার নিম্নস্তর হইতে উচ্চ স্তরে চলে—জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতে। একথা অবশ্য সত্য যে, উপনিষদে মানবীয় আত্মার অধঃপতন, পশ্চাদ্‌বর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে, মানব-আত্মাকে পশুদেহ ধারণ করিতে হইবে। যে আত্মা মানবীয় শক্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে কি কারণে পশুদেহ পছন্দ করিবে? ইহা হইতে পারে যে, জীবাত্মা মানুষের দেহ লইয়া পশুর মতন জীবন যাপন করিতে

থাকে। আবার এই কথাও ঠিক যে, আত্মা তাহার বাসনা কামনা অনুযায়ী দেহ ধারণ করে। সে হয় তো অতি মন্দ কর্ম্ম করিয়াছে এবং দৈহিক ইন্দ্রিয়-লিপ্সা যথেচ্ছাচার ভাবে চরিতার্থ করিবার জন্য পশুজীবন পছন্দ করিয়াছে এবং মৃত্যুর সময়ে তাহার সেই ইচ্ছা অতি প্রবল ছিল এবং সেই বাসনা লইয়াই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, তবে তাহাকে নিশ্চয়ই পশুদেহ ধারণ করিতে হইবে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। ইত্যাদি (গীতা ৮।৬)।

অর্থাৎ মানুষ যেই যেই ভাব স্মরণ করিতে করিতে অন্তে শরীর ত্যাগ করে অর্থাৎ মরে, সে সেই সেই ভাবেই মিশিয়া যায়।

যথা ক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি
তথৈতঃ প্রেত্য ভবতি (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩।১৪।১)।

অর্থাৎ মানবের যেরূপ ক্রতু অর্থাৎ সংকল্প হয়, মরণের পর সে সেইরূপ গতিই লাভ করে। ইহা হয় অসৎ চিন্তার ফলে। কিন্তু এই যে পশুস্বভাব জীবাত্মা প্রাপ্ত হয় তাহা সাময়িক। এই অবস্থা হইতে আত্মা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আবার উচ্চস্তরে যায়, সে তখন তাহার ভুল বুঝিতে পারে। বিবর্ত্তনবাদ বা ক্রমবিকাশের নীতি ও নিয়ম অনুযায়ী পরিশেষে সে মনুষ্য দেহ ধারণ করে। তাহা ছাড়া, বাস্তব সত্যের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, ক্রমবিকাশ নীতি কখনই উচ্চ শ্রেণী ব্যতীত নিম্নশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ স্বীকার করে না (Theory of Evolution).

পুনর্জন্মের তত্ত্বের মীমাংসার প্রধান বিষয় হইল:—আমাদের অতীত বলিয়া কিছু আছে কিনা। বর্ত্তমান জীবন আমাদের একটি আছে তাহা আমরা জানি। ভবিষ্যৎ বিষয়েও একটা স্থির অনুভূতি থাকে, তথাপি অতীতকে স্বীকার না করিয়া বর্ত্তমানের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব?

বর্ত্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, জগতের কখনও বিনাশ নাই, কেবল অবস্থান্তর ঘটে, অবিচ্ছিন্ন উহার অস্তিত্ব। জলকণা বাষ্পাকারে

ঊর্দ্ধে উঠিয়া মেঘ হয়, আবার সেই মেঘ হইতে জলকণা বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়ে। জন্মান্তরবাদ মানুষকে এই পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে না। মানুষের আত্মা অন্য উচ্চস্তর লোকে গিয়া মহত্তর জীবন যাপন করিতে পারে; অবশেষে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা অমৃতত্ব লাভ করিবে, নির্ব্বাণের গভীর আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিবে।

পশুর মধ্যে আত্মা ঘুমাইয়া থাকে, দৈহিক শক্তি ভিন্ন অপর শক্তির সন্ধান সে পায় না। মানুষের মর্য্যাদা বোধ ও উচ্চ আদর্শই তাহাকে আত্মশক্তির কাছে সমর্পিত হইতে উদ্বুদ্ধ করে।

ভাল বস্তু দেখিয়া বা ভাল গল্প শুনিয়া মানুষ যে উন্মনা হয় তাহার কারণ এই যে, নিশ্চয় গতজন্মের কোন হৃদয়ের আকর্ষণ-বস্তুর স্মৃতি তাহার মনে অস্পষ্ট ভাবে জাগিতে থাকে।

আত্মার নাশ নাই এবং উনি মহাভূত সমুদয়কে কখন পরিত্যাগ করেন না। লোকের যে পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পূর্ব্বতন রূপ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়; কর্ম্মক্ষয় হইলেই তাহার ফলের অন্যথা হইয়া থাকে। লোকে পরলোকে আত্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া পুনরায় যখন ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, তৎকালে উহার রূপের পরিবর্ত্তন হয়। ফলতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে কিছুই দুর্লভ থাকে না; কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দৈববল লইয়া থাকিলে কিছুই লাভ হয় না। মনুষ্য যে যে শরীরে যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহাকে পরজন্মে সেই সেই শরীরে সেই সেই অবস্থায় তৎ তৎ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ফলভোগ ব্যতীত কর্ম্ম কদাচ বিনষ্ট হয় না।

সংস্কার সাক্ষাৎ কারণাৎ পূর্ব্ব-জাতি-জ্ঞানম্ (পাতঞ্জল—৭।১৮)

অর্থাৎ সংস্কার পূর্ব্বজন্মের অভিজ্ঞতার ফল। ইহা আমাদের মনের অবচেতন স্তরে সংরক্ষিত থাকে। ইহা কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যোগী অবচেতন মনের সুপ্ত সংস্কারের উপর আত্মসংযমের সাহায্যে

ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া প্রবল মন সংযোগ করিয়া বিগত জীবন-সমূহের ঘটনাবলী স্মরণ করিতে পারেন। যোগী যে তাঁহার শুধু নিজের জীবনকেই জানিতে পারেন তাহা নহে, বরঞ্চ অপরের কথাও অভ্রান্তরূপে বলিয়া দেন। গৌতম বুদ্ধ তাঁহার পাঁচশত জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারিতেন বলিয়া শোনা যায়। শ্রীকৃষ্ণ জাতিস্মর যোগী ছিলেন, তাই তিনি অর্জ্জুনের ও তাঁহার নিজের বহুবার জন্মগ্রহণের কথা বলিয়াছিলেন।

আমাদের অবচেতন মন হইল বিভিন্ন জীবন-সকলের অভিজ্ঞতাজাত সংস্কারের ভাণ্ডার। সংস্কারগুলি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় সেই স্থানেই, বেদান্ত যাহাকে চিত্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। চিত্ত অর্থে সকল সংস্কারের ভাণ্ডাররূপী অবচেতন মন। অনুকূল পরিস্থিতি ও ইচ্ছা তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিয়া আনে মনের চেতনার স্তরে।

মনুষ্য স্বীয় অজ্ঞানতা ও অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের সংসর্গবশতঃ বারংবার দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসংখ্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে; সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণ প্রভাবে তাহার কখন দেবযোনি কখন মনুষ্যযোনি ও কখন পশুযোনি লাভ হয়। যেমন ষোড়শ কলাপূর্ণ চন্দ্রের পঞ্চদশ কলারই বারংবার ক্ষয় ও বৃদ্ধি হয় কিন্তু ষোড়শ কলার (অমাবস্যায়) ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মার স্থূলদেহই বারংবার নাশ ও উৎপত্তি হয় কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না। আর যেমন প্রলয়কালে ষোড়শী কলার ক্ষয় হইলে চন্দ্রের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়, তদ্রূপ জীবাত্মার সূক্ষ্মশরীর ক্ষয় হইলেই জীবাত্মার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। স্থূল দেহের প্রতি মমতা থাকিতে জীবাত্মার কখনই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। জীবাত্মা স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ দেহের সংসর্গ বশতঃ অপবিত্রতা, চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও জড়দেহের সংসর্গ বশতঃ জড়ত্ব এবং নির্গুণ হইয়াও ত্রিগুণাপ্রকৃতির সংসর্গ বশতঃ ত্রিগুণত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

আত্মা আপন ইচ্ছানুসারে দেহ ধারণ করতে পারেন না। আত্মা

তাঁহার কর্ম্ম অনুযায়ী দেহ ধারণ করিতে বাধ্য। ভাল কাজে উচ্চ প্রাণীর দেহ, মন্দকাজে ইতর প্রাণীর দেহধারণ করেন আত্মা।

দিবাকর যেমন সমুদিত হইয়া স্বীয় কিরণজাল চতুর্দ্দিকে বিস্তার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তৎসমুদয় আপনার দিকে টানিয়া লইয়া অস্তগমন করেন তদ্রূপ, অন্তরাত্মা ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক পুনরায় উহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া দেহ হইতে অন্তর্হিত হন। মানবগণ বার বার স্বীয় কর্ম্মানুরূপ গতিপ্রাপ্ত হইয়া পুণ্য ও পাপ-প্রবৃত্তির অনুসারে জন্মগ্রহণ করে ও সুখদুঃখ ভোগ করে। ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি ইহারা কেহই স্ব স্ব কারণ অবগত নহে। কিন্তু সত্যস্বরূপ জ্ঞানময় আত্মা উহাদের সকলকেই সন্দর্শন করিতেছেন। ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা এবং জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা, জীবাত্মা হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে মনের উৎপত্তি হইয়াছে। মন ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইলেই শব্দাদি সুখদুঃখ ইত্যাদি ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

ভুলের জন্যই মানুষ অসৎ কর্ম্ম করে আর অজ্ঞানতা বশতঃ সেই ভুল হয়। ভুল করে না এমন মানুষ জন্মায় না। এই ভুল হইতে আরও শিক্ষালাভ হয়। একটা জন্মে সব অভিজ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব বলিয়া আরো জন্মের দরকার হয়। কাজে কাজেই পুনর্জন্মবাদ মানিতে হয়। জীবনের উদ্দেশ্য হইতেছে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করা।

ক্রমবিকাশের নিয়ম যাহাই হউক না কেন, যখন অসৎ কর্ম্ম বা অসৎ চিন্তার ফলে আত্মা ইতর প্রাণীর দেহ ধারণ করিতে পারে আবার সেই ইতর প্রাণীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঞ্চিত মানবীয় উৎকর্ষতা থাকা হেতু সে পুনরায় মানবদেহ ধারণ করিতে পারে। একটা সত্তাই তো বাস্তবিক আছে—মূলে তো সবাই এক।

চিন্তাশীল ও তত্ত্বজ্ঞানী এবং অসাধারণ প্রতিভাশালী চরিত্রগুলির বিষয়ে সমালোচনা করিলে পুনর্জন্মবাদকে অস্বীকার করা যায় না। জীবাত্মার পূর্ব্ব

জন্মের সঞ্চিত অভিজ্ঞতারই বর্ত্তমান জীবনে অভিব্যক্তি ঘটে। ব্যাস, বাল্মীকি, শুকদেব, জয়দেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, বুদ্ধদেব, যিশু, কালিদাস, ব্যোপদেব, মীরা, খনা, গার্গী প্রভৃতি ইহ জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই যে সকল অমানুষিক ঘটনাবলীর দ্বারা নিজ নিজ জীবন সার্থক করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। প্রহ্লাদ, ধ্রুব, উদ্ধব, নাচিকেত, শনক, সুনন্দন প্রভৃতি অপ্রাপ্ত বয়সেই ভক্তিরসের দ্বারা জগৎ প্লাবিত করিয়াছেন। কাশীরাম, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস প্রভৃতি ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বিজ্ঞানীরা চিকিৎসাজগতে অসাধ্যসাধন করিতেছেন। তাঁহারা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে সব কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, অব্যক্তের সন্ধান দিতেছেন, নিত্য নূতন আবিষ্কার করিতেছেন তাহা মানববুদ্ধির কল্পনাতীত। নিশ্চয়ই এগুলি তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রারব্ধ কর্ম্মের সঞ্চিত কর্ম্মফলের বহিঃপ্রকাশ মাত্র; তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুনর্জন্ম বাদে যাঁহারা বিশ্বাসী নন তাঁহারা উত্তরাধিকারসূত্রের সাহায্যে জীবন-মরণ-রহস্যের মর্ম্ম বোঝাবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহাতে প্রকৃত উত্তর মিলে না। প্রতিভা, জ্ঞান বা অলৌকিক শক্তির কারণের রহস্য ভেদ করা যায় না; কিন্তু আত্মার পুনর্জন্মবাদ অথবা দেহান্তর বাদের সাহায্যে ভালভাবেই তাহা করা যায়।

১। মেষপালক মঙ্গিয়ামেলা পাঁচ বছর বয়সে গণনা যন্ত্রের মতো গণনা করিতে পারিত।

২। সাত বছরের শিশু কালবার্ন না লিখিয়া দুরূহতম গণিতের প্রশ্নের উত্তর দিত।

৩। বিখ্যাত সংগীতকার "মোজার্টের" বয়স যখন ৪ বৎসর তখন তিনি একটি অপেরা রচনা করিয়াছিলেন।

৪। টম্ নামে এক নিগ্রো ক্রীতদাস অন্ধ বালক হঠাৎ একদিন পিয়ানোতে গানের সুর বাজাইতে থাকে। সে-সংগীত সে কোনদিন আগে

কাহারও কাছে শোনে নাই বা শিখে নাই; সংগীতে সেছিল ওস্তাদ। নিজেই সে সংগীত রচনা করিতে পারিত।

৫। গ্যালিলিতে তখন অনেক মেষপালকই ছিল কিন্তু যীশুর মত কেহ মেষপালকের উত্তরাধিকারী হইয়াও তাঁহার মত হইতে পারেন নাই। যে হেতু তাঁহাদের পক্ষে বর্তমান জীবনে ঐগুলি লাভ করা অসম্ভব; অতএব অবশ্যই পূর্ব্ব জীবন হইতেই ঐ গুণ গুলি আসিয়াছে।

৬। বুদ্ধের সময় ভারতে তো আরও অনেক রাজকুমার ছিলেন কিন্তু রাজকুমার শাক্যসিংহই একমাত্র বুদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন। কেমন করিয়া এত সব হইল?

৭। শেকস্‌পিয়ার, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ অথবা শঙ্করাচার্য্যের বংশাবলী ঘাঁটিলে তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভাশালী হইবার এমন কোন শক্তির খোঁজ মিলে না। সুতরাং দেখা যায়, উত্তরাধিকার সূত্রের নিয়ম অনুযায়ী এইসব তাজ্জব ব্যাপারের রহস্য ভেদ করা কখনই সম্ভব পর নহে।

পুরাণে কথিত রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ তিন ভ্রাতাই বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র; কিন্তু রাবণ রজোগুণী, কুম্ভকর্ণ তমোগুণী এবং বিভীষণ সত্ত্বগুণী। উত্তরাধিকার সূত্রে এই তিন প্রকার প্রকৃতির জীব হওয়া অসম্ভব।

হিরণ্যকশিপু দৈত্য ছিলেন। হরিভক্তের ঘোর বিরোধী কিন্তু তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদ হরিভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতাকে চাক্ষুষ দেখাইয়াছেন যে, হরি সর্ব্বত্র বিরাজমান। ইহার সদুত্তর হইল এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত শুভ কর্ম্মফল আত্মার মধ্যে সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে। ঐগুলি বাস্তবে রূপায়িত হইবার পূর্ব্বে দেহের বিনাশ হইলে, বিকসিত হইতে বিলম্ব ঘটে। পরে উপযুক্ত সময় ও পরিবেশ অনুসারে নূতন দেহে ঐ শক্তিপুঞ্জের জাগরণ ও বিকাশ হইয়া থাকে। এই কারণে অতি অল্প বয়সেই কাহারও কাহারও অলৌকিক প্রতিভার কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষ করা যায়॥

জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং পুনরায় সময়মত জন্মগ্রহণ করে। যতগুলি জীবাত্মা বাহির হয় ঠিক ততগুলি জীবাত্মাই যদি জন্মগ্রহণ করে তবে পৃথিবীর লোকসংখ্যা আর বাড়িত না; যেমনটি সংখ্যা বাহির হইয়া যাইত ঠিক তত্টি সংখ্যাই থাকিত; কিন্তু দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যাউক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের লোক সংখ্যা ছিল ৩০ কোটী; অধুনা ৬০ কোটীতে দাঁড়াইয়াছে। এই ৩০ কোটী বাড়্‌তি জীবাত্মা কোথায় ছিল, কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? এই প্রশ্নের জবাব কি? ইহার জবাব এই যে, পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে প্রত্যেক জীবদেহে প্রবেশ করেন এবং জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি অসীম অনন্ত সুতরাং জীবাত্মাও অসীম অনন্ত; যেহেতু পরমাত্মারই বিশেষ বিকাশ জীবাত্মা। তিনি অনন্ত সুতরাং তাঁহার লীলাও অনন্ত; তাই অনন্ত জীবের সৃষ্টি; সীমাবদ্ধ সংখ্যা নহে। জীবসংখ্যা তাঁহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

কোনও একস্থানে ১০ লক্ষ গৃহ আছে; প্রত্যেক গৃহেই সূর্য্যালোক পতিত হয় এবং উজ্জ্বল হয়। সেখানে যদি আরও ২০ লক্ষ গৃহ নির্ম্মিত হয় তাহা হইলেও এই নব নির্ম্মিত ২০ লক্ষ গৃহে সূর্য্যালোক সমভাবে পতিত হইবে ও উজ্জ্বল হইবে। সূর্য্য পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থকে উদ্ভাসিত করে, প্রকাশ করে উজ্জ্বল করে কিন্তু অন্ধকার নাশ করে। এখানে সূর্য্যরশ্মির কোন সংখ্যা নাই, পরিমাণ নাই, সীমা নাই, অসীম, অনন্ত। রশ্মিগুলি নূতনভাবে সূর্য্যে আবির্ভূত হয় নাই, এগুলি পূর্ব্ব হইতেই সূর্য্যে ছিল ও আছে; রশ্মি অফুরন্ত। পৃথিবীতে, জলাশয়ে এবং দর্পণে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে; তন্মধ্যে পৃথিবী অপেক্ষা জলাশয়ে, জলাশয় অপেক্ষা দর্পণে অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। যদি আরও অনেক পৃথিবী, আরও অনেক জলাশয় এবং আরও অনেক দর্পণ দৃষ্ট হয় তবুও সূর্য্যরশ্মি সর্ব্বত্র সমভাবে প্রতিবিম্বিত হইবে। কোনও হ্রাসবৃদ্ধি থাকিবে না; তদ্রূপ পরমাত্মা হইতে যত অধিক সংখ্যায়ই জীবাত্মা দেহধারণ করুন না কেন, অনন্তশক্তির

হ্রাস হইবে না কোন কালেও। জীবাত্মাগুলি পরমাত্মারই অংশ বিশেষ, অংশ ও অংশীতে কোন প্রভেদ নাই। অনন্ত জীবাত্মাই পরমাত্মার অনন্ত শক্তির পরিচায়ক।

গীতায় (১০।২০) ভগবান বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন, সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে বিরাজমান চৈতন্য আত্মাই আমি। আমিই জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশের কারণ-স্বরূপ। আত্মা অনন্ত, অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে এবং থাকিবে।

পুনর্জন্মবাদ গণিত দিয়া প্রমাণ করা যায় না। পুনর্জন্মবাদ মানুষের নৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক। অতীতে অর্জ্জিত সংস্কারগুলির সমষ্টি আমাদের মস্তিষ্কে আসিয়াছে—ঐ সংস্কারগুলি লইয়া মন এই শরীরে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আমি ঠিক যেমনটি আছি, তাহা আমার অনন্ত অতীতের কর্ম্মফল স্বরূপ। যাহারা পুনর্জন্মবাদ অস্বীকার করে তাহারাই আবার বিশ্বাস করে এক সময় আমরা বানর ছিলাম ; সুতরাং যদি তাহাই হয়, তবে পুনর্জন্ম স্বীকার করা হইল। এইমত ড্যারউইনের মত এবং আধুনিক কাহারও কাহারও মত বটে। যদি আমাদের কোন প্রাচীন ঋষি অথবা সাধু এই মতটিকে অর্থাৎ বানর ছিলাম সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত লইতেন, তবে আধুনিকেরা সে সত্যকে গ্রহণ করিতেন না। যেহেতু হাক্সলি, টিণ্ডাল এবং ড্যারউইন ইহা বলিয়াছেন অতএব ইহা সত্য,—তখন উহা আমরা মানিয়া লই।

পুনর্জন্ম ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন করিতে থাকে। শারীরিক ব্যথা ও মানসিক শোক হইতে ক্রন্দনের উৎপত্তি। ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই দুঃখজ্ঞান, এই অনুভূতি, এই ক্রন্দন কোথা হইতে আসিল ?

একটি কুক্কুট এই মাত্র ডিম হইতে বাহির হইয়াছে। একটা বাজ পাখী আসিল, অমনি ভয়ে সে তাহার মায়ের কাছে পলাইয়া গেল। কোথা হইতে এই সদ্যোজাত শাবকটি শিখিল যে, কুক্কুট বাজের খাদ্য ? উহার মরণ-ভয় কোথা হইতে আসিল ?

ডিম্ব হইতে সম্ভ বহির্গত হংস, জলের নিকট আসিলেই জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে এবং সাঁতার দিতে থাকে। উহা কখনও সাঁতার দেয় নাই অথবা কাহাকেও সাঁতার দিতে দেখে নাই। এই ভূমিষ্ঠ শিশুর ক্রন্দন, সদ্যোজাত কুক্কুটের মৃত্যু-ভীতি ও হংসের সন্তরণ যাহা যাহা দেখা যায় সব কার্য্যই পূর্ব্বকার্য্য ও পূর্ব্বঅনুভূতির ফল এবং স্বাভাবিক জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক জীবজন্তুই কতকগুলি অনুভূতির সমষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; তাঁহারা ইহাও মানেন যে, মনের এই সকল কার্য্য পূর্ব্ব অনুভূতির ফল। কিন্তু তাঁহারা বলেন ঐ অনুভূতিগুলি বংশানুক্রমিক (Hereditary transmission) কিন্তু তাঁহাদের এটা ভুল ধারণা। ইহা যে ভুল তাহা "উত্তরাধিকার" সূত্রে দেখান হইয়াছে। পুনর্জন্মবাদের সারমর্ম্ম এই যে, আত্মা দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবে। কখন স্বর্গে যাইবে, আবার পৃথিবীতে আসিয়া মানবদেহ ধারণ করিবে অথবা অন্য কোন উচ্চতর বা নিম্নতর জীবশরীর পরিগ্রহ করিবে। এইরূপে উহা অগ্রসর হইতে থাকিবে যতদিন না উহার অভিজ্ঞতা অর্জন শেষ হয় এবং পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়েরই মত—এই সৃষ্টি, এই প্রকৃতি, এই মায়া অনাদি অনন্ত। জগৎ কোন বিশেষ দিনে সৃষ্ট হয় নাই। একজন ঈশ্বর আসিয়া এই জগত সৃষ্টি করিলেন তারপর তিনি ঘুমাইতেছেন, ইহা হইতে পারে না। সৃষ্টি কারিণী শক্তি এখনও বর্ত্তমান। ঈশ্বর অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টি করিতেছেন, তিনি কখনই বিশ্রাম করেন না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ ইত্যাদি (৩।২৩, ২৪) অর্থাৎ যদি আমি ক্ষণকাল কর্ম্ম না করি, তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

জগতে এই যে সৃষ্টিশক্তি দিবারাত্র কার্য্য করিতেছে ইহা যদি ক্ষণকালের

জন্ত বন্ধ থাকে, তবে এই জগৎ ধ্বংস হইয়া যায়। এমন সময়ই ছিল না, যখন সমগ্র জগতে এই শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল না। তবে অবশ্য যুগ শেষে প্রলয় হইয়া থাকে। তখন সমগ্র প্রকৃতিই ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। অবশেষে অব্যক্তভাব ধারণ করে। কিছুকাল অব্যক্ত থাকিয়া পুনরায় প্রকাশ হয়, সৃষ্টি হয়। যখনই আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টির আদি বা অন্তের উল্লেখ দেখা যায় তখনই কোন যুগ বিশেষের আদি, অন্ত বুঝিতে হইবে। উহার অন্য কোন অর্থ-নাই।

ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্ম এই জগৎপ্রপঞ্চের সাধারণ কারণস্বরূপ। তিনি নিত্য, নিত্য-শুদ্ধ, নিত্য জাগ্রত, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, দয়াময়, নিরাকার, অখণ্ড। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন। জগতে বৈষম্য, প্রতি-যোগিতা যাহা যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, সবগুলিই আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করি।

মেঘ সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করে। কিন্তু যে ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষিত হইয়াছে তাহাই শস্যশালী হয়; যে ক্ষেত্র ভালভাবে কর্ষিত নহে, তাহা ঐ বৃষ্টির ফল লাভ করিতে পারে না। ইহাতে মেঘের বা বর্ষণের পক্ষপাতিত্ব নাই। কোন অপরাধ নাই। ঈশ্বরের দয়া অনন্ত ও অপরিবর্ত্তনীয়— আমরাই কেবল সুখদুঃখের বৈষম্য সৃষ্টি করিতেছি। আমাদের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের দ্বারা এই ভেদ, এই বৈষম্য ঘটে।

আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। আত্মার মধ্যে আছে—প্রাণশক্তি, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়শক্তি। এই আত্মাই পিতামাতার মাধ্যমে দেহ সৃষ্টি করে। বেদান্তে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, আত্মা বুঝিতে পারে কোথায় সে ছিল, কে ছিল তাহার জনক জননী।

মানুষের মস্তিষ্ক একটি যন্ত্র বিশেষ। তাহার ভিতর দিয়া যাবতীয় শক্তির বিকাশ সাধন করে আত্মা। ইহা সংস্করণবাদ (Transmission theory). যতদিন বিদেহী আত্মার কর্মফল ভোগ শেষ না হয় ততদিন

উহা কোন এক স্তরে (Dimension) থাকে। তাহার পরে যখন উহা সেই স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করে তখন উহা অদৃশ্য সূক্ষ্মদেহ লইয়া আকাশের মধ্য দিয়া বায়ুতে প্রবেশ করে ; বায়ু হইতে মেঘে, মেঘ হইতে বৃষ্টিবিন্দুর সঙ্গে ধরণীতে পড়ে। তাহার পরে কোন খাদ্যের সঙ্গে মানব দেহে প্রবেশ করিয়া আবার জন্মগ্রহণ করে।

জীবাত্মা অনাদি অনন্ত ; যতদিন না শেষ মুক্তিলাভ হয়, ততদিন তিনি পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। তবে একদিন না একদিন তাঁহার মুক্তিলাভ হইবেই। আত্মা শূন্য হইতে সৃষ্ট নহে, কারণ সৃষ্টি শব্দের অর্থ—বিভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ, ভবিষ্যতে ঐ গুলি বিচ্ছিন্ন হইবে ; আত্মা সৃষ্ট পদার্থ নন, তিনি অজর অমর।

উপাখ্যান

পুনর্জন্ম সম্পর্কে মহাভারতে একটি উপাখ্যান আছে। পূর্ব্বে হিমালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী কোন এক আশ্রমে এক মহর্ষি নিরন্তর বেদপাঠ করিতেন। একদা এক দয়াবান শূদ্র ঐ আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া মহর্ষিকে বিবিধ নিয়ম সম্পন্ন দেখিয়া ও তাঁহাকে দেবতুল্য এবং অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন জ্ঞান করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। স্বয়ং তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন্, আমি শূদ্রবংশ-সম্ভূত হইয়াও ধর্ম্ম শিক্ষার মানসে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া চরিতার্থ করুন। আমি নিরন্তর আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিব।"

তখন কুলপতি মহর্ষি কহিলেন—"বৎস, শূদ্রজাতির সন্ন্যাসধর্ম্মে অধিকার নাই। যদি তোমার নিতান্তই ধর্ম্ম বুদ্ধি হইয়া থাকে তাহা হইলে তুমি এইস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদের সেবাপরায়ণ হও ; পরিণামে তুমি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে সক্ষম হইবে।"

ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রটি এইভাবে মহর্ষি কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সেই আশ্রমের অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন এবং তন্মধ্যে বেদী, শয়নস্থান ও দেবস্থান সমুদয় প্রস্তুত করিলেন এবং স্বয়ং তপঃপরায়ণ হইয়া বহুদিন যাপন করিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদা সেই আশ্রম-কুলপতি মহর্ষি ঐ শূদ্রের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। শূদ্র মহর্ষিকে দেখিয়া তাঁহার যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। মহর্ষি শূদ্রের ভক্তি দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সহিত মিষ্টালাপ করিয়া নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অতি অল্পদিন মধ্যে পুনরায় ঐ শূদ্রের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার সহিত মহর্ষির বিলক্ষণ সৌহার্দ্য জন্মিল। প্রতিদিন তিনি উহার আশ্রমে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা ঐ শূদ্র মহর্ষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্, আমার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় পিতৃকার্য্য করিবার বাসনা করিয়াছি; আপনাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।" শূদ্র তাঁহাকে এইরূপ অনুরোধ করিলে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া মহর্ষি "তথাস্তু" বলিয়া তাহার বাক্য স্বীকার করিলেন। শূদ্র তখন মহর্ষির আদেশানুসারে যথাস্থানে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যাদি সন্নিবেশিত করিয়া শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন। মহর্ষি বিদায় লইয়া নিজ আশ্রমে গমন করিলেন।

অনন্তর শূদ্রতাপস তথায় দীর্ঘকাল তপঃঅনুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পুণ্যবলে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন; এবং সেই মহর্ষিও যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পুরোহিত কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন।

কালক্রমে শূদ্রতাপস যে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই রাজবংশের বৃদ্ধ রাজা পরলোক গমন করেন এবং সেই বংশজাত শূদ্রতাপস যুবরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রজাগণ রাজকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজকুমার রাজা হইয়া ইহজন্মে যিনি পুরোহিতকুলে জন্মগ্রহণ

করিয়াছেন সেই ব্রাহ্মণ-কুমাররূপী মহর্ষিকে তাঁহার পৌরহিত্যে বরণ করিলেন। এইরূপে রাজা রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং পুরোহিতও রাজকীয় ধর্মানুষ্ঠানে কর্তব্য পালন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন অনুষ্ঠান সময়ে পুরোহিত যদি রাজার দৃষ্টিপথে পড়িতেন রাজা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন। রাজার এইরূপ বারবার হাস্য দর্শনে পুরোহিতের ক্রোধের উদ্রেক হইল। তখন তিনি রাজার সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ করেন ও শিষ্টালাপ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন—"মহারাজ, আমি আপনাকে কোন একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিয়াছি, যদি অকপটে আমার নিকট উহা ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি।" রাজা কহিলেন "ব্রাহ্মণ, যদি আমি আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় অবগত থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই প্রকাশ করিব"।

তখন পুরোহিত কহিলেন, "মহারাজ, স্বস্তিবাচন শান্তি ও হোমাদি বিবিধ ধর্মকার্য্য সময়ে আপনি যে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাস্য করেন, তাহার কারণ কি? আপনি হাস্য করাতে আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত হইতে হয়।"

নরপতি কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে এই বিষয় অবক্তব্য হইলেও আপনার নিকট কীর্ত্তন করা আমার অবশ্য কর্তব্য।"

এক্ষণে আমি আমার হাস্যের কারণ প্রকাশ করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। আমি জাতিস্মর; আমার পূর্বের জন্মে যাহা-যাহা ঘটিয়াছিল, তৎ তৎ সমুদয় আমি সবিশেষ অবগত আছি। পূর্বজন্মে আমি তপস্যানিরত শূদ্র ছিলাম এবং আপনি উচ্চতর তপঃপরায়ণ উগ্রতেজা মহর্ষি ছিলেন। আপনি আমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ প্রকাশ-পূর্বক আমার পিতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া শ্রাদ্ধ বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই কর্মনিবন্ধন ইহজন্মে আপনি পুরোহিত হইয়াছেন

এবং আমি রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি. কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আপনাকে দেখিবামাত্র এই কারণে হাস্য করিয়া থাকি। আপনি আমার গুরু, আমি আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া হাস্য করি না। আমি শূদ্র হইয়াও জাতিস্মর রাজা হইলাম আর আপনি মহর্ষি হইয়াও হীন ও সামান্য বৃত্তিধারী পুরোহিত হইলেন। ইহা কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে? কেবলমাত্র শ্রাদ্ধে উপদেশ প্রদান করাতে কর্মে লিপ্ততা হেতু আপনার তাদৃশ কঠোর তপশ্চারণ একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি পৌরোহিত্য পরিত্যাগ পূর্বক পুনরায় উৎকৃষ্ট জন্মগ্রহণের নিমিত্ত যত্নবান হউন; আর যেন আপনাকে ইহা অপেক্ষা অধম যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে না হয়। এক্ষণে আপনি এই ধনরাশি গ্রহণ-পূর্বক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। এই কারণে লোকে বলে—"জন্ম হউক যথা তথা কর্ম হউক ভাল"।

নিম্নোক্ত কবিতা হইতে বারংবার পুনর্জন্ম এবং ভালমন্দ কর্মফল-জনিত জীবাত্মার উর্দ্ধগতি ও নিম্নগতি পথে বিচরণ সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায় :—

'ওরে ক্ষুদ্র, অবজ্ঞাত, ওরে শূদ্র ভাই,
দেবত্বের পথে যেতে কারো বাধা নেই।
নিজ দোষে, পররোষে, পাপে কিংবা শাপে
জন্মিয়াছ হীনকুলে—এ হেন প্রলাপে
পাতিও না কর্ণ তব। চন্দ্র, সূর্য যাঁর
জ্ঞানের রচনা সেই বিশ্ব-বিধাতার পুত্র তুমি,
আছে তব পূর্ণ অধিকার সেবিতে তাঁহারে সদা
ধ্যানে কিংবা জ্ঞানে।

———

: ৪ :

শব-সংস্কার প্রথা

শবদাহ প্রথার প্রচলন প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বৈদিকযুগে যে শব-সংস্কার প্রথার প্রচলন ছিল ঋক্‌বেদের মন্ত্রই তাহার প্রমাণ। শবদাহ প্রথা মৃত ব্যক্তির দেহের সংস্কার সাধন করিবার একটি উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর নিয়ম। হিন্দুরা আত্মাকে দেহ হইতে একেবারে পৃথক বস্তু বলিয়া মনে করেন, আর এই আত্মাই মানুষের আসল স্বরূপ। দেহটা আত্মার ধারক ও আবরণ। অবিনশ্বর আত্মা দেহকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে দেহের আর কোন মূল্যই থাকে না।

মরণের সময় দেহ হইতে এক প্রকার সূক্ষ্ম বায়বীয় জ্যোতিষ্মান পদার্থ নির্গত হইয়া যায়। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত এই পদার্থটির আবরণকে প্রেত শরীর বা সূক্ষ্মদেহ বলে। ঐ সূক্ষ্ম দেহই মৃত্যুর পর থাকে; কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম দেহটি মরণের পর যায় কোথায়? আত্মা তখন সূক্ষ্ম শরীরে আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত হইয়া সমুদয় বৃত্তি ও সংস্কার সহ বিচরণ করিতে থাকে; কিছুক্ষণের জন্য মৃত দেহটির চারিপাশে ঐ সূক্ষ্মদেহ ঘোরা ফেরা করে; সম্ভবতঃ যদি ঐ মৃতদেহটিকে কবরে রক্ষা করা যায় তাহা হইলে উহার উপর বিদেহী আত্মার আকর্ষণ থাকে; কেননা বহুকাল ধরিয়া সেই দেহের প্রতি তাহার অতিশয় প্রীতি ও গভীর আসক্তি ছিল। প্রাণ দিয়া ইহাকে ভালবাসিয়াছিল। সেইহেতু ইহাকে ছাড়িয়াও ছাড়িতে তাহার কষ্ট হইত।

এই জন্যই হিন্দুদের বিশ্বাস যে, মৃতদেহকে কবরে না রাখিয়া পুড়িয়া ফেলাই আসক্তি ত্যাগের উত্তম ও শ্রেষ্ঠতম পন্থা। তাহাতে আত্মা বা জীবাত্মা দেহ কিংবা দেহের মায়া হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

তাহা না হইলে, যদি দেহটাকে কবরে রাখিয়া দেওয়া যায় তবে তাহা দেখিবার জন্য আত্মার মায়ার আকর্ষণ, ইচ্ছা বা কৌতূহল অনেকদিন অবধি থাকিবে। আত্মা একান্ত আগ্রহে দেখিতে চায় কবরের ভিতরে তাহার শরীরের কি দশা হইল। কিন্তু আত্মার পক্ষে ইহা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় অবস্থা; কেননা, আত্মাকে ইহাতে অসুখী ও বেদনাতুর হইতে হয়। তাহা ছাড়া, অমন সুন্দর আদরের দেহটি দিনে দিনে নষ্ট, গলিত ও বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে ইহা দেখিলে জীবাত্মার দুঃখ হইবারই তো কথা। কাজেই পরলোকে গিয়া আত্মা দুঃখ কষ্ট পাইবে ইহা কখনও মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের কাম্য হইতে পারে না। এইজন্য হিন্দুদের মধ্যে দেহটাকে অগ্নিসংযোগে পোড়াইয়া উহাকে দ্রুত নষ্ট করিবার ব্যবস্থা আছে। মৃত দেহটাকে যতশীঘ্র ধ্বংস করা যায় তত শীঘ্র আত্মার পক্ষে সেই দেহটাকে ভুলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক এবং যে জীর্ণ শরীরটাকে অব্যবহার্য্য বলিয়া আত্মা একবার পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার সত্তাকে বিস্মৃত হওয়াই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

মৃতদেহের অগ্নিসংস্কার একটি উৎকৃষ্ট রীতি। স্বাস্থ্যের দিক হইতেও ইহা খুবই ভাল। যে পঞ্চভূতে শরীর সৃষ্ট হইয়াছে অগ্নিদাহ দ্বারা সেই পঞ্চভূতে মিলাইয়া দেওয়াই উচিৎ। মৃতদেহটি ভস্মীভূত হওয়ায় তাহার উপর জীবাত্মার কিংবা অপর কাহারও মায়া বা আসক্তি অথবা আকর্ষণ থাকে না, থাকিলেও ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়।

বেদেও আমরা এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাই। উহাতে অনেক স্থলে অগ্নি সংস্কারই (cremation) বরং অধিকতর প্রশংসিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলে মৃতদেহে অগ্নিসংস্কার বা অনগ্নিধান বা কবর দেওয়া এই দুই প্রকার প্রথারই উল্লেখ আছে। অনেক সময় শবদেহকে অর্দ্ধ দগ্ধ করিয়াও কবর দেওয়ার প্রথা ছিল। ঋগ্‌বেদে শব-সৎকারের যে সব মন্ত্র পাওয়া যায়, তাহাতে আছে—হে অগ্নি, তুমি আকাশ ও পৃথিবী

হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তুমি জান—সত্যিকারের পিতৃলোকের পথ কোন্‌টি। সেখানে তুমি সেই পথ আলোকিত করিবার জন্য উজ্জ্বল হও। (১) হে মৃত্যু, তুমি ভিন্ন পথে যাও, যে পথে দেবতারা যায়, সে পথ ত্যাগ কর। (অর্চির মার্গ) (২)

যাও, যাও, সেই পথে যাও যে পথে গিয়াছেন আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা। সকল পাপ দূরে সরাইয়া দিয়া জ্যোতির্ময়দেহে ফিরিয়া যাও সেই প্রেত লোকে, সেখানে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হও। (৩)

অগ্নির সাতটি লেলীহমান জিহ্বা বিদ্যমান যথা—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বিশ্বরুচী।

(অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদ) (১।২।৪)

উপরোক্ত মন্ত্রসমূহ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সেকালে আত্মাকে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া যথাশীঘ্র অনন্ত পরমাত্মার সহিত মিলিত করাইয়া সালোক্যাদি মুক্তি প্রাপ্তির সহায়তা করাই ছিল অগ্নিদাহ প্রভৃতি বিবিধ মঙ্গলকর প্রথার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়॥

ঃ ৫ ঃ

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা

শ্রাদ্ধের আবশ্যক আছে। কারণ, মানুষ যখন আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া সকাম কর্ম্মফলে বদ্ধ হইতে থাকে, তখন শ্রদ্ধার কর্মই মানুষের একমাত্র কল্যাণকর হইয়া থাকে; কেননা শ্রদ্ধার দ্বারা কর্ম করিতে পারিলে কর্মের ফলপ্রাপ্তি আশা থাকে না; তজ্জন্য কর্ম নিষ্কামতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রবৃত্তির নিম্নগতিপথ অবরুদ্ধ হইয়া নিবৃত্তির উর্দ্ধগতিপথ

পরিষ্কৃত হইয়া উঠে এবং মানুষ সহজেই নিবৃত্তির পথে ঊর্দ্ধগতিতে গমন করিতে থাকে। অতএব প্রবৃত্তির আসক্তি কমাইবার জন্য একমাত্র শ্রদ্ধাকর্ম বা শ্রাদ্ধ কর্মই মানুষের মঙ্গলজনক হইতেছে।

নিরুক্তিতে উক্ত আছে—
শ্রৎসত্যম্ দধাতি যয়া সা শ্রদ্ধা,
শ্রদ্ধয়া ক্রিয়তে যৎ তৎ শ্রাদ্ধম্।

অর্থাৎ শ্রৎ শব্দে সৎ পদার্থ ব্রহ্মকে বুঝায়। যদ্বারা সেই সত্য বা ব্রহ্ম পদার্থ লাভ করা যায় সেই প্রকার যাবতীয় ক্রিয়াকে শ্রদ্ধা কহে; সেইহেতু শ্রদ্ধাযুক্ত যে কোন প্রকার ক্রিয়াকর্মই শ্রাদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়।

শ্রদ্ধা কিম্—"গুরু-বেদান্ত বাক্যেষু বিশ্বাস":—ইতি শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরু-বাক্য (গুরুর মুখ হইতে শ্রুত শাস্ত্রাদি বিষয়ক উপদেশ) এবং বেদাদি যাবতীয় শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" ইত্যাদি (গীতা ৪।৩৯) অর্থাৎ শ্রদ্ধাদ্বারা প্রকৃত জ্ঞান (পরম জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করা যায়।

"অন্যেত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে" ইত্যাদি (গীতা ১৩।২৫) অর্থাৎ কেহ কেহ অপরের নিকট হইতে পরমাত্মার বিষয়ে শুনিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে উপাসনা করিলেও মৃত্যুকে জয় করিতে পারে।

শ্রদ্ধার কর্ম—শ্রাদ্ধ দ্বিবিধ; যথা—একোদ্দিষ্ট ও পার্বণ। একের উদ্দেশ্যে কৃত—একোদ্দিষ্ট, আর পিতৃসাধারণের উদ্দেশ্যে কৃত—পার্বণ।

পৃথিবীতে যাঁহারা থাকেন আপনার জন (আত্মীয়-স্বজন) তাঁহারা কল্যাণ কামনা বিতরণ করেন পরলোকবাসী প্রেতাত্মাদের উদ্দেশে। সেই কল্যাণ চিন্তা হৃদয়স্থ বায়ুকে সূক্ষ্ম কম্পনে কম্পিত করে; ফলে, সেই সূক্ষ্ম কম্পনগুলিই পৌঁছায় প্রেতাত্মাদের কাছে। বাহিরে যে সকল বেদবাক্য (বেদমন্ত্র) উচ্চারণ করা হয়, শ্রাদ্ধের সময় সেগুলিও বায়ুতে কম্পিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহাদের নিকট পৌঁছায় এবং এইভাবে প্রেতাত্মার মুক্তির কারণ ঘটে।

পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে বহু ঋক্‌মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রাদ্ধের সময় তাঁহাদের উদ্দেশে নানাবিধ উৎকৃষ্ট উপচার খাদ্য, পানীয়রূপে গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করা হয়। পিণ্ডদান অর্থে ইহাই বুঝায়। বিদেহী আত্মার স্মরণ উদ্দেশে এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান।

আমাদের নিত্য ক্রিয়ার অন্তর্গত পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে পিতৃযজ্ঞ অন্যতম। তর্পণ, যজ্ঞ এই ক্রিয়ার অঙ্গ বিশেষ। স্বল্পক্ষণের জন্য পরলোক গত পিতৃপুরুষদের প্রীত্যর্থে এবং তাঁহাদের গুণাবলীর স্মরণার্থে এই নিত্য ক্রিয়ার প্রথা বহুকালপূর্বে হিন্দুদের মধ্যে ঋষিগণ কর্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল।

"কুর্য্যাদহরহঃ যজ্ঞং অন্নাদ্যেনোদকেন বা,
পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহম্।"

(মনুসংহিতা)

অর্থাৎ অন্নাদির দ্বারা জলদ্বারা, দুগ্ধদ্বারা অথবা ফল মূল দ্বারা এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ অর্ঘ্য দ্বারা অর্থাৎ পার্থিব জীবনের তাঁহাদের প্রিয়বস্তু দান-দ্বারা পরলোক গত পিতৃগণের প্রীতির উদ্দেশ্যে প্রত্যহ শ্রদ্ধার্ঘ্য, ভোজ্যদান, যজ্ঞ (অগ্নিহোত্র) করা আবশ্যক। শ্রাদ্ধে দান-ধ্যান, কাঙ্গালী বিদায় ইত্যাদি যে সকল প্রথা চালু আছে, হিন্দুদের বিশ্বাস—মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সমস্ত সৎকাজ করিলে তাহার ফল তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার অগ্রগতি ও হিতসাধনে সাহায্য করে অর্থাৎ তাঁহাদের প্রেতজীবনের (নবজন্মের) পরিপোষক হয়। মৃতের স্মরণে অনুষ্ঠিত সকল ধর্মকর্ম তাঁহাদের শুভ ফলদান করিবেই এবং এইসব ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠাতাদের হৃদয়ে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির উদ্রেক করে এবং দীনজনে অন্নবস্ত্রাদি দানে ও বিবিধ সৎকর্মে উৎসাহিত করে। এইভাবে প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা প্রেতাত্মাদের মনের নিগূঢ় অন্তস্তলে একটা কল্পনা সৃষ্টি করে—ফলে তাঁহাদের সুপ্তজ্ঞান বা যাপ্য পূর্বানুভূতি আবার জাগ্রত হয় এবং তখনই তাঁহারা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন যে, সত্যিকার তাঁহাদের এককালে বহুযত্নে লালিত ও পরে পরিত্যক্ত

দেহ আর নাই এবং তাঁহাদের ফিরিয়া যাওয়ার কোন উপায়ও নাই; সুতরাং তাহার জন্য মায়া করিয়া লাভ নাই।

পৃথিবীতে আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দন, শোকোচ্ছ্বাস, তাঁহাদের সূক্ষ্ম প্রাণময় সত্তাকে কষ্ট দেয়, তাই তাঁহারা প্রেতলোকে যাইতে বাধ্য হন; এইসব প্রিয়জন বিচ্ছেদজনিত দুঃখানুভূতিই তাঁহাদের আত্মাকে নিম্নগতিতে প্রেতলোকে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু আত্মীয়স্বজনের কল্যাণেচ্ছা তাঁহাদের লুপ্ত জ্ঞানকে ফিরাইয়া আনে এবং ঠিক তখনই তাঁহারা পৃথিবী ও অপার্থিব জগতের সীমানা দেশ (Border land) পার হইবার চেষ্টা করে। সেই সীমানা দেশও আসলে কম্পনের সমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সেই কম্পনের সমষ্টিটা যে একটা ইথার স্রোত বা সূক্ষ্ম আকাশের নদী (Etherial flow)। তাহাকে তুলনা করা যায় জন্ম—মৃত্যু বা জীবলোক—প্রেতলোকের মধ্যবর্ত্তী (Neutral Zone) নিরপেক্ষ স্থানের সঙ্গে। হিন্দুরা এই স্থান বা অবস্থাকেই বলেন "বৈতরণী"। ঐ সীমানা দেশ বা বৈতরণী অনায়াসে পার হইতে পারে না সেইসব আত্মা, যাঁহারা অতি নগণ্য সাধারণ অর্থাৎ ধনজন-বিষয়-আশয়াদি সম্বন্ধীয় চিন্তাভাবনায় অর্থাৎ জড় জগতের বা পৃথিবীর মায়ায় আবদ্ধ।

সাধারণতঃ তাই তাঁহারা যান এমন সব স্থানে যেখানকার সর্বত্র আকাশ বাতাস গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। উপনিষদে সেই সব প্রেত-লোকের এই প্রকার বর্ণনা রহিয়াছে :—

অসূর্য্যা নামতে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ
তাং স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ।

(ঈশঃ উপঃ ।৩)

অর্থাৎ বিধাতার সৃষ্ট এই বিশাল বিশ্বের অনন্ত মহাকাশে এমন সব লোক বা স্তর আছে, যেখানে অনন্তকাল ধরিয়া অন্ধকার রাজত্ব করে। সেখানে সূর্য্য বা অন্য কোন গ্রহের আলোক পড়েনা। যাঁহারা আত্মার

স্বরূপ উপলব্ধি করেন না বা যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা পর্য্যন্ত করেন না তাঁহারাই মরণের পর (after death) ঐসব অন্ধকার লোকে যায়।

প্রেতলোক সূক্ষ্মলোক ; এই সূক্ষ্ম জগৎ কেবল অনুভূতি গ্রাহ্য। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ, তারা প্রভৃতি স্থূল বস্তুসমূহের জ্যোতিঃ প্রকাশ বা দীপ্তির প্রভাব হইতে মুক্ত। সুতরাং শোক, দুঃখ বা অশ্রু বিসর্জন না করিয়া বিদেহী আত্মার উর্ধ্বগতি বা মায়ামোহজাল হইতে মুক্তির জন্য তাই জানাইতে হয় ভগবানের নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা। তাহাতেই প্রেতলোকবাসীদের হয় সদ্গতি, অজ্ঞান অন্ধকারে তাঁহারা দেখিতে পান আলোক দীপ্ত পথ ও নিরাশার মাঝে পান আশার সান্ত্বনা, নির্মল সুখ ও একান্ত ঈপ্সিত ব্রহ্মনির্বাণ বা মোক্ষ।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে কুশতৃণের সাহায্যে একরকম ব্রাহ্মণের প্রতিকৃতি নির্মাণ করা হয়, তাহাকে দর্ভময় ব্রাহ্মণ, বা কুশব্রাহ্মণ বলে। কুশ ব্রাহ্মণ বা দর্ভময় ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভূত মৃত আত্মার প্রতীক। শ্রাদ্ধে কুশব্রাহ্মণের যথাযোগ্য পূজা অর্চনা মৃত আত্মারই সদ্গতি কামনায় করা হইয়া থাকে এবং এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড অধস্তন উত্তরাধিকারীদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও সদিচ্ছার নিদর্শন।

বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে বিল্ব বা যজ্ঞডুম্বর অথবা নিম্ব প্রভৃতি যজ্ঞীয় কাষ্ঠে একটি যূপ তৈয়ারী করা হয়, এই যূপটিকে "বৃষকাষ্ঠ" বলে। ভারতের বিভিন্নস্থানে প্রথামত কোথাও মানুষের মূর্তি, কোথাও বা বৃষমূর্তি, কোথাও বা গ্রহরাজ সূর্য্যের প্রতীক মূর্তি বা অন্য কোন প্রতীক এই যূপ কাষ্ঠে খোদাই করা হয়। বৃষকাষ্ঠে বৃষমূর্তি খোদাই করার কারণ হিসাবে বৃষের চতুষ্পাদের ন্যায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গফল যেন মৃত আত্মা লাভ করে।

ধর্ম্ম অর্থে—শুভকার্য্যে প্রবৃত্তি, অর্থ—টাকা পয়সা নহে পরমার্থ অর্থাৎ পরলোকে সদ্গতি ; কাম অর্থে ঈশ্বর প্রাপ্তির অভিলাষ ; মোক্ষ অর্থে—মুক্তি।

শ্রাদ্ধ শেষে দীর্ঘ বৃষ কাষ্ঠটি মৃতের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন বা স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ কোন প্রকাশ্যস্থানে বা জলাশয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি গোচর করিয়া রক্ষা করা হয় যাহাতে অপর লোকেরাও এ প্রকার শ্রাদ্ধাদি পুণ্য কর্মে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রাপ্ত হয়।

কুশপুত্তলিকা:—কোন লোক দূরদূরান্তরে বা বিদেশে মারা গেলে যদি তাহার মৃতদেহ না পাওয়া যায়, তবে তাহার কল্পিত প্রতিকৃতির প্রতীক হিসাবে পর্ণদাহ বা কুশপুত্তলিকা তৈয়ারী করিয়া সেটাকে দাহ করিবার ব্যবস্থা বা রীতি আছে। ৩৬০টি পলাশপত্র বা কুশপর্ণ দিয়া এই পত্র প্রতীক বা পর্ণমূর্তি তৈয়ারী করা হয়। পিতৃপুরুষ পূজার এটিও অপর একটি তাৎপর্য-পূর্ণ উত্তম দৃষ্টান্ত।

শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষদের পূজার অর্থ—তাঁহাদের দেহাতীত আত্মার অস্তিত্বে ও অনৈসর্গিক ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নানাবিধ উপচার নিবেদনের মাধ্যমে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন (শ্রাদ্ধ) ও তৃপ্তিসাধন (তর্পণ) করা। এভাবে প্রেতাত্মাগণের সেবা করিবার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য—তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি জাগ্রত করা যাহাতে তাঁহারা আমাদের পার্থিব জীবনের শুভ-অশুভে, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যে, সুখে দুঃখে, সম্পদে-বিপদে তাঁহাদের অলৌকিক শক্তির-প্রভাব বিস্তার দ্বারা আমাদের সহায়তা করিতে পারেন। অপর উদ্দেশ্য—কৃপাপ্রার্থনা। ঐ সব লোকান্তরিত প্রেতাত্মগণের কেহ কেহ যদি তাঁহাদের জীবৎকালে তাঁহাদের বংশধর বা সন্তান সন্ততিদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ করিয়া থাকেন, মৃত্যুর পরে যেন তাঁহারা শ্রাদ্ধাদি গ্রহণে ক্রোধ প্রশমিত করিয়া তাঁহাদের অদৃশ্যশক্তি প্রয়োগে প্রতিশোধ লওয়ার পরিবর্তে আমাদের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া আমাদের জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞতাপ্রসূত দোষ ত্রুটি বা অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সর্ববিধ কার্যে আশীর্বাদ বর্ষণ করেন।

পিণ্ডদান ও জলদান

শ্রাদ্ধকর্মের অপর একটি আনুষঙ্গিক বা আনুষ্ঠানিক অঙ্গ—প্রেতাত্মাদে উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ও উদকতর্পণ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ আছে বর্ণসংক প্রসঙ্গে—

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
'পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদক ক্রিয়া।' (১।৪১)

অর্থাৎ কোন বংশের—সে বংশ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্য যাহাই হউক—যদি বর্ণসংকর অর্থাৎ মিশ্রবর্ণের সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহ হইলে সে সন্তানের জাতিবর্ণ কিছুরই স্থিরতা নাই বলিয়া, সে কো জাতিবর্ণোচিত ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকারী হয় না। প্রেতপুরুষদের পিণ্ডোদব ক্রিয়া লুপ্ত হইলে তাঁহাদের আত্মার পতন বা অধোগতি হয়, অর্থাৎ নরব গমন হয়; সুতরাং মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া একান্ত আবশ্যক।

পিণ্ডোপনিষদে পিণ্ডদান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—কোন ব্যক্তির মৃত্যু পরে মৃত্যুদিবস হইতে অশৌচান্ত দিবস পর্যন্ত ১০ দিনে মৃতের উদ্দেশে ১০টি পিণ্ডদান করিতে হয়। কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে—

প্রথম দিনের পিণ্ডদানে মৃতব্যক্তির আত্মার ষোড়শ কলা গঠিত হয় এই ষোড়শ কলার সংখ্যা এইরূপ যথা—পঞ্চভূত (ক্ষিতি অপ্ তেজ মরু ব্যোম); পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ অপান ব্যান সমান উদান); ষড়রিপু (কা ক্রোধ লোভ মোহ মদ্ মাৎসর্য)।

দ্বিতীয় দিনের পিণ্ডে হয়—মাংস, চর্ম্ম, রক্তসঞ্চয়

তৃতীয় দিনের পিণ্ডে হয়—বুদ্ধি সংযোগ

চতুর্থ দিনের পিণ্ডে হয়—অস্থি, মজ্জাসংগ্রহ

পঞ্চম দিনের পিণ্ডে হয়—হস্ত-পদের অঙ্গুলিসমূহ, শিরঃ, মুখগঠন

ষষ্ঠ দিনের পিণ্ডে হয়—হৃদয়, কণ্ঠ, তালু সংগঠন

সপ্তম দিনের পিণ্ডে হয়—দীর্ঘায়ু যোগ

অষ্টম দিনের পিণ্ডে হয়—বাক্যপুষ্টি ও মৃতব্যক্তির পরবর্তী দেহে বীর্য্যবত্তা সঞ্চার।

নবম দিনের পিণ্ডে হয়—সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ

দশম দিনের পিণ্ডে হয়—ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক হইলে তাহার শান্তি বা প্রশমন।

এভাবে দশদিনের দশটি পিণ্ড দ্বারা প্রেতলোকে মৃতের সূক্ষ্মদেহ হইতে স্থূলদেহ গঠিত হয়। মনুষ্যের মরণের অব্যবহিত পরেই আতিবাহিক নামে দেহ লাভ হয়। প্রেতপিণ্ড দানের দ্বারা এই দেহের পরিবর্তে ভোগদেহ নামক এক দেহ প্রাপ্ত হয়। সংবৎসরান্তে সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ দ্বারা ভোগদেহের পরিবর্ত্তে অন্য দেহ লাভ হয়। তখন কর্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে গমন হয়; কিন্তু কুলনাশে পিণ্ডাদি দানের অভাব হেতু প্রেতাত্মার নিরন্তর নরকে বাস হয়। (শ্রীরঘুনন্দন—"শ্রাদ্ধ তত্ত্ব")

শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ দ্রব্য—(১) কেদো ধানের চাউল; (২) তুষসহ ধানের চাউল; (৩) হিং, পেঁয়াজ, রসুন, সজিনা ডাঁটা; (৪) গাজর, লাউ, কুমড়া, পানিফল; গোলাপজাম, কালজাম, জামরুল; (৫) ক্ষতদূষিত দ্রব্য; (৬) নেত্রজলযুক্ত দ্রব্য; (৭) কৃষ্ণজীরা ও (৮) সকল প্রকার লবণ।

(মহাভারত অনুশাসন)

নিষ্ঠুর নৃশংস নিষ্করুণ হৃদয়ে দয়ামায়ার লেশমাত্র থাকে না—জীবিত কি মৃত কাহারো প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিও থাকে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণে দয়াবৃত্তি না জাগে, ততক্ষণ তাহার দ্বারা শ্রাদ্ধক্রিয়া বা শ্রদ্ধার কার্য হইতে পারে না; কেননা, দয়া হইতে প্রীতি, ভালবাসা জন্মে। প্রীতি হইতে শ্রদ্ধার উৎপত্তি। শ্রদ্ধাহীনের দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। যাহার প্রাণে দয়া না থাকে তাহার দ্বারা উপাসনা হইতে পারে না। দয়া হইতে কর্তব্য জ্ঞান জন্মে। কর্তব্য জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মে নিষ্কামতা হইয়া থাকে। কর্ম্ম নিষ্কাম অর্থাৎ ফলাফল শূন্য হইলেই প্রেম জন্মে, প্রেম

হইতে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে, ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটিলে জীবন্মুক্তি লাভ হয়, তাহাতে কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়; আত্মার আর জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় না। সুতরাং দয়াই একমাত্র গুণ যাহা হইতে শ্রদ্ধা লাভ করা যায়।

: ৬ :

স্বর্গ ও নরক

হিন্দুরা স্বর্গে বিশ্বাস করেন কিন্তু কোন যথার্থ নরক আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। অথচ পুরাণে নরকের বিভীষিকাময় বর্ণনা পাওয়া যায়। হিন্দুরা মনে করেন যে, স্বর্গ এমন একটি জায়গা যেখানে ধার্মিক ব্যক্তিরা মৃত্যুর পরে তাঁহাদের পুণ্যকর্মের ফলভোগ করিতে যান সেখানে গিয়া তাঁহারা কিছুকাল থাকেন—যতকাল পুণ্যকর্মের ফল ক্ষয় না হয় ততকাল। সে পুণ্যফল ভোগ শেষ হইলে আবার তাঁহারা মর্তে ফিরিয়া আসেন।

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।" (গীতা ৯/২১)

স্বর্গই হউক অথবা যে কোন লোকই হউক, সেখান হইতে আত্মাকে ফিরিয়া আসিতেই হইবে।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন"। (গীতা ৮।১৬)

প্রাচীন আর্য্য অথবা হিন্দুরা একটি মাত্র স্বর্গে বিশ্বাস করিতেন তাহার নাম ব্রহ্মলোক।

বেদান্তে স্বর্গ কিংবা নরকের বিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনা দেখা যায় না। বেদান্তের মত এই যে, যাঁহারা স্বর্গে যাইতে চান, তাঁহার

স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারেন। যিনি নরকের চিন্তা করেন তিনি নরকই দেখেন। যাহা ভাবা যায়, তাহাই হইয়া উঠে। (যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী)।

স্বর্গ ও নরক আসলে মানুষের মনেরই বিভিন্ন অবস্থা। বাহিরে স্বর্গ ও নরকের কোন স্বকীয় সত্তা নাই। যতকাল অজ্ঞানতা থাকে, ততকাল তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তার কথা মনে হয়; কিন্তু পরম সত্যের উপলব্ধি হইলে আর জন্ম মৃত্যু বলিয়া কোন কিছু থাকে না। আত্মা তখন বিরাজ করেন আপন মহিমায়। বেদান্তের মতে স্বর্গ অনেক আছে। সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতালের উল্লেখ পাওয়া যায় পুরাণে। আমাদের হিন্দু মতেও অনেক স্বর্গ আছে যথা—পিতৃলোক, দেবলোক, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক, বরুণলোক, বিদ্যুল্লোক ও (শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্মলোক; ব্যক্তি-সত্তার আত্মা যে কোন লোকে যাইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা উচ্চস্তরের অধ্যাত্ম-জীবন কামনা করেন, তাঁহারা অনন্ত ও অখণ্ড ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত কেবলই চলিতে থাকেন। ব্রহ্ম-নির্বাণ প্রাপ্তির পর আর আত্মার পুনর্জন্ম হয় না, গতানুগতিক চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (গীতা ৮।১৬)

আমরা যাহাকে স্বর্গ বলি, তাহা আমাদের কর্মের ফল হিসাবে সৃষ্টি করা লোক বা স্তর বিশেষ। অপর অপর স্বর্গে বা বায়বীয় স্তরে এমন অনেক আত্মা আছে, যাহারা দীর্ঘ ভ্রমণে ক্লান্ত ও ভোগে পরিশ্রান্ত; তাহার কারণ—তাহারা তার আগের চেয়ে আরো চাক্ষুষ, আরো প্রত্যক্ষ, আরো স্পষ্ট আদর্শের পূর্তি অথবা চিন্তার অনুভূতি চায়; সুতরাং তখন তাহারা এতদপেক্ষা উচ্চতর উন্নততর একটা ভিন্ন রাজ্যে বা স্বর্গে যাইতে চায়।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরকের কোন স্থান নাই; যদি কোন শাস্তি পাইবার স্থান থাকে তো, তাহা এই ধরণীই। পৃথিবীতেই মানুষ তাহার অসৎ কর্মের ফলস্বরূপ শাস্তি বা প্রতিফল পাইয়া থাকে।

যখন কোন জিনিস পাওয়ার জন্য আমাদের বাসনা অত্যন্ত প্রবল হয় অথচ তাহা না যদি পাই এবং তাহার জন্য যে অতৃপ্তির অবস্থা, তাহাকেই বলে নরক। যেমন কৃপণ লোক অভ্যাস বশতঃ তাহার টাকা কড়ি সময় সময় নাড়া চাড়া করে, সাজাইয়া রাখে; কেননা, ঐ টাকাকেই সে প্রাণ দিয়া ভালবাসে। এখন সে মরণের পর প্রেতলোকে সূক্ষ্ম বায়বীয় স্তরে গেলে, তাহার সঙ্গে থাকে কিন্তু সেই টাকাকড়ির উপর মমতা, আকর্ষণ; কিন্তু সেই অনির্দ্দেশের রাজ্যে, পার্থিব টাকাকড়ি আর থাকে না যাহা লইয়া সে নাড়াচাড়া করিবে, সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবে; কাজেই সে হা-হুতাশ করিয়া কষ্ট পায় আর তাহার সেই অবস্থাটাই হইল নরক বা শাস্তি ভোগ। নরক আমরা নিজেরা সৃষ্টি করি আমাদের অসৎ চিন্তা ও অসৎ কাজ দিয়া। মনে ও শরীরে নরক যন্ত্রণা অথবা স্বর্গসুখ আমরা ভোগ করি কিছুকাল ধরিয়া। এই সুখ বা দুঃখের ভোগও সাময়িক ভাবে কিছুক্ষণের জন্য সত্য বলিয়া মনে হয়, যেমন, যতক্ষণ আমরা স্বপ্ন দেখি ততক্ষণের জন্য সে স্বপ্ন বাস্তব সত্য বলিয়া মনে হয়।

স্বর্গ ও নরক দুই-ই অনিত্য। তবে মরণের পরে মানুষ বা প্রাণীদের পক্ষে এ ধরণের একটা অগ্রগতি হয়। হয় তাহারা আনন্দলোকে স্বর্গে যাবে, নয়তো তাহারা অাৎ কর্ম্মের ফলে নরকে যাবে।

স্বর্গ আমাদের পরিচিত এই জগতের পুনরাবৃত্তি মাত্র। আমাদের সকল নিয়ম ও বিপর্যয়, আনন্দও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্য, উন্নতি ও অবনতি সবই এই ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্বর্গ-নরক বলিয়া বাস্তবিক যদি কোন স্থান থাকে, তাহা এই জগতেরই অন্তর্গত। সমুদয় মিলিয়া এই এক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। অতৃপ্ত কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তির

জন্য ভোগপূর্ণ একটা স্থানের কল্পনা বা ধারণা হইতেই 'স্বর্গ' নামক স্থানের উৎপত্তি হইয়াছে।

যাহাদের নিকট পৃথিবী কেবল ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য, যাহাদের সমগ্র জীবন আহার এবং প্রমোদে ব্যয়িত হয়, যাহাদের সহিত পশুদিগের ব্যবধান অতি সামান্য, তাহারা স্বভাবতই এই জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব লক্ষ্য করিয়া এমন একটি স্থানের কল্পনা করে, যেখানে তাহারা অনন্ত ভোগ-সুখ লাভ করিতে পারিবে। তাহাদের মতে স্বর্গ অসীম ; আকাঙ্ক্ষা পূরণের একটি স্থান।

এই পৃথিবীর সাদৃশ্য বাদ দিয়া স্বর্গের ধারণা কোন ধর্মেই দিতে পারে নাই। ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে চলিয়া গেলে আত্মারূপে, ঈশ্বররূপে সব কিছুই একাকার প্রতিভাত হইবে। যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যাবানুপশ্যতি। তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ (গীতা)—যে ব্যক্তি সর্বভূত বা সকল প্রাণীকে নিজের আত্মার মধ্যে দেখিতে পায় তাহার আর মায়া মোহ শোক দুঃখ কিছুই থাকে না। তাহার কাছে সুখ দুঃখের অনুভূতিও শূন্যময়। তখন বুঝিতে পারা যাইবে স্বর্গাদি লোক সবকিছুই এইখানে অবস্থিত। মানুষ ভাবে—মর্ত্ত্যলোক পাপময় এবং স্বর্গ অন্য কোথাও পৃথিবীর উর্দ্ধে অবস্থিত।

নাস্তিক স্বর্গে যাইতে চায়না, কেননা তাহার মতে স্বর্গ নাই। ভগবদ্ভক্ত স্বর্গে যাইতে চান না, তিনি কেবল ঈশ্বরকেই চান। স্বর্গ আমাদের বাসনাসৃষ্ট কুসংস্কার মাত্র। এই যে, স্বর্গে যাওয়ার কামনা সুখভোগের কামনা, এ কামনা ত্যাগ করিতে হইবে। কেননা, এ সুখভোগ কল্পনামাত্র এবং অলীক অসত্য অনিত্য।

"নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মে'ব ভূয়ঃ এবাভিবর্দ্ধতে।" (মহাভারত)

অর্থাৎ কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না পরন্তু অগ্নিতে ঘৃত প্রদানের ন্যায় উহা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

জঁহা কাম, তঁহা রাম নহি, জঁহা রাম, তঁহা নহি কাম।
কবহুঁ ন মিলত বিলকিয়ে রবি রজনী এক ঠাম॥

অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোক একসঙ্গে থাকিতে পারে না। কাম থাকিতে রাম মিলে না, রবি ও রজনী একস্থানে থাকে না। ভক্তের প্রেম ভক্তি ভালবাসা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ হইতে হইবে। জড় ধরণীর জড়তা-জনিতধূলি, যিনি গাত্র হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে সমর্থ হইবেন তিনিই স্বর্গ দর্শনের অধিকারী হইবেন। তখনই সর্বোচ্চ জ্ঞান তোমার হইবে যখন তুমি স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইবার জন্য সংসারকে—বিষয়ভোগের বিলাসকে ঘৃণ্য বলিয়া বর্জন করিতে শিখিবে।

যাঁহারা স্বর্গভোগের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বভাব হয় প্রশান্ত নির্ম্মল। দানশীলতা, উদারতা, মধুরবাক্য, দয়াকর্ম্ম ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাদের চরিত্র সুসংগঠিত হয়।

যাহারা নরক ভোগের পর আবার জন্মগ্রহণ করে তাহাদের স্বভাব ও কর্ম্মপন্থা হয় নিষ্ঠুর, নৃশংস, নিন্দনীয়; কর্ম হয় স্বার্থপরতায় পূর্ণ, প্রকৃতি হয় খল, কৃপণ, সাধুদিগের নিন্দা পরায়ণ, কুখাদ্যে রুচি, কুবেশধারী, কটুভাষী, ক্রোধী।

গীতায় উল্লেখ আছে—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ (গীতা ৬।৪১)

যোগভ্রষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মযোগ হইতে ভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যকর্ম্মকারি দিগের স্বর্গাদিলোক লাভ করিয়া এবং সেখানে বহু বৎসর বাস করিয়া (উষিত্বা) পবিত্র এবং লক্ষ্মীমন্ত লোকের গৃহে জন্ম লাভ করেন (অভিজায়তে)।

সজ্জন ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া অনন্ত সুখময় জীবনযাপন করেন—

এই ধারণা বৃথা স্বপ্ন মাত্র। ইহার বিন্দুমাত্র অর্থ বা যৌক্তিকতা নাই। যেখানে সুখ সেখানে কোন না কোন সময় দুঃখ আসিবেই। যেখানে আনন্দ সেখানে বেদনা নিশ্চিত। ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, যেভাবে হউক প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া থাকিবেই। কারণ এই বিরাট বিশ্ব কেবল দ্বন্দ্বময়—বৈপরীত্যের সমাবেশ মাত্র।

কবি গাহিয়াছেন—

'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর।
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেই সুরাসুর।'

ঃ ৭ ঃ

শালগ্রাম শিলা

অদ্বৈত মতে—ব্রহ্ম নির্বিকল্প, নির্গুণ এবং সমস্ত বিশেষণ রহিত, নেতি, নেতি, অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্ব, সংকল্পত্ব, জগৎকারণত্ব, অন্তর্যামিত্ব, সত্যকামত্ব ইত্যাদি কোনপ্রকার সগুণভাব তাঁহার নাই। নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য। অনন্তশির, অনন্তবাহু, অনন্তচক্ষু, অনন্তপাদ ইত্যাদি কোন বিশেষণের দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না। শয়ন, উপবেশন, নিদ্রা, জাগরণ, ইত্যাদি ভেদে কোন বৈলক্ষণ্য তাঁহার নাই। শীত, গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ, আলো আঁধার ইত্যাদি কোন জ্ঞান তাঁহার নাই। একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয়ই তাঁহার নাই। তিনি নির্বিকার, সৎ-চিৎ-আনন্দময়। হিন্দুশাস্ত্রে এই শালগ্রাম শিলাকে নারায়ণ পরব্রহ্মের মূর্ত প্রতীক হিসাবে কল্পনা করা হইয়াছে এবং এই কল্পনাই উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতি গৃহে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। দেব-দেবীর মূর্তি যেমন ভাস্করেরা নানা বৈচিত্র্যে নানা রংয়ে, নানা ভঙ্গিতে নির্মাণ করে, শালগ্রাম শিলার সেরূপ কোন বিশেষ ভাব ভঙ্গি নাই এবং নির্মাণ কর্তা

কেহ নাই। কারণ শয়ন, উপবেশন, শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, বাদল ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই তাঁহার কোন বিকার নাই, সব সময়েই তিনি এক প্রকার। এইরূপ নির্বিকার অখণ্ড শিলাখণ্ডকে নারায়ণ পরব্রহ্মের প্রতীক কল্পনা যুক্তি সঙ্গত হইয়াছে। অন্তর্নিহিত ভাবও ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই। যেমন বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ, বলরাম, হর, হরি, মহাদেব, শিব, কালী, দুর্গা, চণ্ডী, মনসা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীকে পরমেশ্বর জ্ঞানে পূজা করা হয়, তদ্রূপ শালগ্রাম শিলাও চক্রচিহ্ন ভেদে নানা নামে অভিহিত হইয়াছে এবং নারায়ণরূপে প্রতিগৃহে অর্চিত হইয়া থাকে। ইঁহাদের নাম, যথা—লক্ষ্মী-নারায়ণ, লক্ষ্মী-জনার্দন, রঘুনাথ, দধিবামন, শ্রীধর, দামোদর, বলরাম, রাজ-রাজেশ্বর, অনন্ত, মধুসূদন, গদাধর, হয়গ্রীব, নরসিংহ, লক্ষ্মী-নরসিংহ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সুদর্শন ও অনিরুদ্ধ।

দেবার্চনা ব্রত যজ্ঞ ইত্যাদি করম
শালগ্রাম বিনা কভু হয় না সাধন।
শালগ্রাম উপরিতে তুলসী না দিলে
শতজন্ম দুঃখ পায় জন্মি ধরাতলে॥
শঙ্খ আর শালগ্রাম তুলসী এ তিনে
গৃহীরা রাখিও গৃহে পরম যতনে।

(ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

নির্গুণ ব্রহ্মে যখন আমরা "জন্মাদ্যস্যযতঃ" অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই গুণত্রয়ের আরোপ করি, তখন তিনি সগুণ হইয়া যান; বস্তুতঃ যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ; আবার যিনি নির্গুণ তিনিই আবার সগুণ। একে অন্যের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়া অন্যটি লওয়া অসম্ভব। যেমন হাতের এপিঠ আর ওপিঠ। এক পিঠে হস্তরেখা দেখিয়া সামুদ্রিকেরা মানুষের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান বলিয়া দেয় অন্য পিঠ অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছ। কিন্তু এক পিঠের জ্বালা যন্ত্রণা অপর পিঠেও অনুভূত হয়।

ভরত ও লক্ষ্মণ উভয়েই রামের একান্ত অনুরক্ত ভ্রাতা। ভরত রামকে নির্গুণ ব্রহ্মভাবে জ্ঞান করিয়া তাঁহার অবর্তমানে রাজ্যশাসন করিতেন আর লক্ষ্মণ সদাসর্বদা রামের সঙ্গে থাকিয়া সগুণ ব্রহ্মভাবে তাঁহার সেবা করিতেন, কিন্তু সেই একই রাম। ভরত রূপময় রামকে গ্রহণ না করিয়া নামময় রামকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; আর লক্ষ্মণ রূপময় রামকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, নামময় রামকে নহে। সুতরাং সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বহির্মুখী এবং নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা অন্তর্মুখী।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা" ; অর্থাৎ ব্রহ্মের কোন রূপ নাই ; সাধকদের উপাসনার সুবিধার নিমিত্ত তাঁহার রূপের কল্পনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মের এই কল্পিতরূপ নানা মূর্তিতে প্রকট আছে। এই প্রকটরূপের উপাসনাই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা। সগুণ উপাসনার দ্বারাই নির্গুণত্বে পৌছিতে হইবে। একব্রহ্ম দ্বিবিধ—সগুণ ও নির্গুণ ; মায়াশ্রিত ব্রহ্মই সগুণ, মায়াতীত ব্রহ্মই নির্গুণ। যেমন, বিদ্যাভ্যাসকালীন পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক হয়, তদ্রূপ প্রথম উপাসনার জন্য সাধকের সাকার অবলম্বন করিতে হয়। বিদ্যাভ্যাস হইলে পর তাহার যেমন পুস্তকের আবশ্যক হয় না, অধীত বিষয়ের ভাবরাশি যাহা পাঠকের অন্তরে নিহিত আছে সেই ভাবরাশি দ্বারা সে শত শত পুস্তক প্রণয়ন করিতে সক্ষম হয়। তদ্রূপ সাধকের সাকার উপাসনার মূর্তিটির অধীত বস্তুভাব গ্রহণ করিবার পর, মূর্তিটি নিরাকার হইয়া যায় ; এই নিরাকার ভাবই নির্গুণ ভাব, সুতরাং শালগ্রাম শিলায় সগুণ নির্গুণ দুই ভাবই বর্তমান। তজ্জন্য এই শিলা নারায়ণ পরমব্রহ্মরূপে কল্পিত হইয়াছে।

শালগ্রাম শিলায় ঈশ্বরের বিভূতি বহুল পরিমাণে আছে বলিয়াই শালগ্রাম শিলায় সকল দেবতারই পূজা করা যায় ; উহাতে কোন দেবতার আবাহন ও বিসর্জন করিতে হয় না ; কিন্তু শালগ্রামে কালী প্রভৃতি শবাসনা দেবীর পূজা করা নিষিদ্ধ। শালগ্রাম শব্দের ব্যুৎপত্তি–

শালঙ্কায়ন মুনি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতে করিতে সম্মুখে সহসা শালবৃক্ষের আবির্ভাব দেখিলেন। পরক্ষণেই বৃক্ষের তলদেশে বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—"আমি গণ্ডকী নদীতে শিলারূপে উৎপন্ন হইতে চলিলাম।" এইজন্যই ঐ শিলারূপী বিষ্ণুর নাম শালগ্রাম (বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থ)। শালে (শালবৃক্ষ সমীপে) গ্রামঃ (শালঙ্কায়ন মুনিনা সহ আমন্ত্রণং যস্য (আহ্নিক কৃত ১ম ভাগ)।

বসুধারা

প্রাচীনকালে সত্যধর্মপরায়ণ, নারায়ণের পরমভক্ত উপরিচর নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি পরিণামে কলেবর ত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। এই মহাত্মা বহুকাল স্বর্গে বাস করিয়া ব্রহ্মশাপ বশতঃ স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন; ঐ স্থানেও তাঁহার ধর্ম-বুদ্ধির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি ভূগর্ভে থাকিয়াও নারায়ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তি প্রদর্শন ও নারায়ণের মন্ত্র জপ করিয়া তাঁহার প্রসাদে পুনরায় মহীতল হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

একদা দেবগণ মহর্ষিদিগকে কহিলেন—"অজ ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করাই কর্তব্য। শাস্ত্রানুসারে ছাগ পশুকেই অজ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। মহর্ষিগণ কহিলেন—বেদে নির্দিষ্ট আছে, বীজ দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, বীজের নামই অজ; অতএব যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করা কদাপি কর্তব্য নহে। যে ধর্মে পশুছেদন করিতে হয় তাহা সাধুলোকের ধর্ম বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না, বিশেষতঃ ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ। এইযুগে পরহিংসা করা নিতান্ত অবৈধ ও অকর্তব্য।

দেবগণ ও মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপে বাদানুবাদ করিতেছেন, এমন সময় মহারাজ উপরিচর তথায় আগমন করিলেন। তখন মহর্ষিরা দেবতাদিগকে কহিলেন—"দেবগণ, এই মহাত্মাই আমাদিগের সন্দেহ দূর করিবেন। এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল ও সর্বভূতের হিতানুষ্ঠানে তৎপর, ফলতঃ ইনি সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ; অতএব আমরা এই বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কদাচ বিপরীত সিদ্ধান্ত করিবেন না"।

ঋষিগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া মহারাজ উপরিচরের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, ছাগপশু ও ঔষধি এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তুর দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্তব্য? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; আপনি উহা নিবারণ করুন"। তখন মহারাজ উপরিচর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন—"আপনাদিগের মধ্যে কাহার কি মত, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন"।

মহর্ষিগণ কহিলেন—"মহারাজ! আমাদিগের মতে ঔষধি বীজ অর্থাৎ ধান্য দ্বারাই যজ্ঞ করা বিধেয়। কিন্তু দেবগণ বলিতেছেন, যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করাই শ্রেয়। আমাদের মতে আপনি যাহা বলিবেন তাহাই প্রমাণ। এক্ষণে এ বিষয়ে আপনার কি অভিপ্রায় তাহা প্রকাশ করুন"।

তখন মহারাজ উপরিচর দেবগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন—"হে মহর্ষিগণ, ছাগপশু ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান বিধেয়।" তখন সেই ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষিগণ মহারাজ উপরিচরকে আপনাদের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে কহিলেন,—"তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া এই কথা কহিতেছ; অতএব অচিরাৎ তুমি দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হও; আজ অবধি তোমার দৈবলোকে গতিরোধ হইল, তুমি আমাদিগের অভিশাপ প্রভাবে ভূমিভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে।" মহর্ষিগণ

এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু ভগবানের প্রসাদে তাঁহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইল না।

এই সময় দেবগণ সমবেত হইয়া স্থিরচিত্তে উপরিচর মহারাজের শাপমোচনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন—এই ধর্মাত্মা আমাদের নিমিত্তই অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার শাপ মোচনের জন্য উপায় বিধান করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া হৃষ্টমনে উপরিচরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন—"মহারাজ! তুমি ভগবান বিষ্ণুর প্রতি গাঢ়তর ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাক। তিনি সুরাসুরগণের পরম গুরু; তিনিই প্রসন্ন হইয়া তোমার শাপ মোচন করিয়া দিবেন। অতএব আমরা এক্ষণে তোমার উপকারার্থে তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি অভিশাপ দোষে যতদিন ভূগর্ভে বাস করিবে, ততদিন যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহ-ভিত্তিতে ঘৃত ধারা প্রদান করিবেন সেই ঘৃত ভক্ষণ দ্বারা তোমার ক্ষুৎ পিপাসা নিবৃত্ত হইবে। ঐ ঘৃত ধারাকে লোকে বসুধারা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে।" হিন্দুরা তাঁহাদিগের দশবিধ সংস্কারে যজ্ঞকালে গৃহ-ভিত্তিতে এই বসুধারা স্থাপন ও তাহাতে ঘৃতধারা প্রদান করেন।

ঃ ৯ ঃ

ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেক

যে সমস্ত ব্যক্তি রূপবান্, অবিকলাঙ্গ, দীর্ঘায়ু, বলশালী এবং স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন হইতে বাসনা করেন এবং মানবসমাজে আদর্শস্থানীয় শ্রেষ্ঠব্যক্তি হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি পশুহিংসা ও মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকে সর্বভূতের মিত্র বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি পরের

মাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত অনুতাপ করিতে হয়। যিনি মাংসের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং মাংসকে একটি উপাদেয় খাদ্যরূপে জানিয়াছেন তিনি মাংস পরিত্যাগ অতি দুষ্কর মনে করেন। যিনি সর্বজীবে দয়াই প্রধান ধর্ম মনে করেন এবং তদনুযায়ী কার্য করেন তিনি ধন্য; তাঁহাকে জীবের প্রাণদাতা বলিয়া অভিহিত করা যায়। সর্বশাস্ত্রে মানবের ইহাই প্রধান কর্তব্য ও ধর্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মানুষ মাত্রেরই আত্ম প্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা কর্তব্য। যখন সিদ্ধিলাভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদিগের মৃত্যুভয় বিদ্যমান, তখন মাংসোপজীবী দুরাত্মাগণ কর্তৃক নিপীড়িত অজ্ঞ জন্তুগণ যে মৃত্যুভয়ে ভীত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি!

মাংস ভোজন পরিত্যাগ—ধর্ম, স্বর্গ ও সুখের মূলীভূত কারণ। অতএব অহিংসাকেই পরমধর্ম, উৎকৃষ্ট তপস্যা ও সত্যস্বরূপ বলিয়া জানিবে। প্রাণী বধ ভিন্ন তৃণ, কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ড হইতে মাংসলাভের সম্ভাবনা নাই; সেই নিমিত্ত মাংস ভোজন দূষনীয় হইয়াছে। যাহারা রসনাকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই চরিতার্থ মনে করে, তাহাদিগকে রজোগুণের আধার রাক্ষস বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ঘাতকেরা কেবল মাংস-ভোজীদের নিমিত্তই জীব হত্যা করে; যদি মাংস ভোজন না থাকিত, তাহা হইলে ঘাতকেরা কখনই জীবহত্যারূপ পাপকার্যে প্রবৃত্ত হইত না। সমাজেও ঘৃণ্য বলিয়া অবহেলিত হইত না। কসাই প্রভৃতি বৃত্তিধারী লোকদের প্রতি সমাজে অনাদর ও অবজ্ঞাসূচক ব্যবহারের জন্য মাংসভোজীরাই দায়ী।

যাহারা পশুহিংসাবৃত্তি আশ্রয় করে তাহাদের আয়ুঃক্ষয় হয়। লোভ, বুদ্ধি, মোহ অথবা পাপাত্মাদিগের সংসর্গ বশতঃ মনুষ্যদিগের পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সকল জন্ম জন্মান্তরে উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতে হয়।

যে ব্যক্তি স্বয়ংমৃত অথবা অন্য কর্তৃক নিপাতিত প্রাণিগণের মাংস ভোজন করে, তাহাকে হত্যাকারীর ন্যায় ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংস ভোজন করে তাহাদের হত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি স্বয়ং মাংস ভোজনে বিরত হইয়াও অন্যকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা করে তাহাকেও বধভাগী হইতে হয়; রন্ধনকারী ও ভোজনকারী উভয়কে ঘাতকের তুল্য মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।

প্রবৃত্তিমার্গের ধর্মের লক্ষণ কেবল গৃহীদের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে; কিন্তু মোক্ষার্থীদের পক্ষে কখনই উহা ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; অর্থাৎ গৃহে অতিথি আসিলে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া গৃহী জ্ঞান করে। তাঁহার রুচিমত জীবহত্যা করিয়াও ঐ অতিথির পরিচর্য্যার বিধি শাস্ত্রে আছে; ইহা ব্রহ্মের সাকারমূর্তির কল্পনা মাত্র এবং সকাম কর্ম; কিন্তু যাঁহারা মোক্ষার্থী অর্থাৎ নির্গুণ, নিষ্ঠাবান্, মুক্তিকামী তাঁহাদের নিষ্কামকর্মের প্রয়োজন; সুতরাং অহিংসাই তাঁহাদের একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ।

নানাপ্রকার রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহাদের রুচি পরিতৃপ্তির জন্য নানাবিধ পথ মুনিরা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, যেহেতু একপ্রকার খাদ্য সকল রুচির পক্ষে প্রযোজ্য নহে।

পূর্বকালে ঋষিরা ব্রীহি দ্বারা যজ্ঞ সমাপন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ধান্যবীজকে ব্রীহি বলা হয়। ইহার অপর নাম "অজ"। কোন কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছাগপশুকে "অজ" বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন; তজ্জন্য ছাগপশুকে যজ্ঞে বলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রথা মাংসভোজীদের রুচিসম্মত হওয়ায় অনেকেই ধান্যবীজের পরিবর্তে 'অজ' শব্দে ছাগ অর্থই অনুমোদন করিয়াছেন এবং তদবধি যজ্ঞে ছাগবলি প্রথাই চলিয়া আসিতেছে।

অপরদিকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা তপঃপ্রভাবে ধ্যানবলে ব্রহ্মের নানাবিধ

মূর্তির কল্পনা করিয়াছেন। এই কল্পিত দেব-দেবীর পরিতুষ্টির জন্য যজ্ঞের ব্যবস্থা হইয়াছে; যজ্ঞে বলি দিতে হয় এই প্রথা প্রচলিত থাকায় যজ্ঞে পশুবলি হইত। কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্ব মানবীয় জ্ঞানে বুঝিতে হইবে যে, পশু পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বে পৌছানই মানবধর্ম; এই মানবধর্মই দেবত্ব লাভের সোপান। এই ধর্ম লাভ করিতে হইলে অহিংসনীতি, দয়াধর্মনীতি, সর্বাঙ্গীন সমভাব নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। যাঁহারা এই পৃথিবীতে কর্মফলে দেবভাবাপন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যেন আবার সংসর্গদোষে হিংসাবৃত্তি, নিষ্ঠুর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের দেবভাব বিনাশ না করেন এবং অধঃপতিত না হন। দেবোদ্দেশে পশু বলিই হউক অথবা অন্য কোন উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যই হউক যাহা কিছু দেওয়া যায় সেগুলি তাঁহারা মানুষের ন্যায় খাদ্যরূপে গ্রহণ করেন না; তাঁহারা ভাবগ্রাহী, খাদ্যগ্রাহী নহেন; নির্মল-হৃদয়ের ব্যাকুল প্রাণের ঐকান্তিক প্রার্থনাই তাঁহারা গ্রহণ করেন।

যাহাদের ধর্মাধর্ম বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না, দেব-দেবী কি, তাহাও যাহাদের উপলব্ধি হয় নাই, আরণ্যজন্তু হত্যা ব্যতীত জীবিকা-নির্বাহের অন্য উপায় যাহাদের জানা ছিল না অথবা অন্য খাদ্যের সন্ধান যাহারা পায় নাই এরূপ অনার্যাদিগকে ধর্মে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত কতিপয় মুনি সেই লোকদিগের রুচির পরিপোষকতা রক্ষার্থে পশুবলির ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন এবং এই প্রথার ভূয়সী প্রশংসার উল্লেখ করিয়াছেন। এইভাবে তাহাদের মাংস ভোজনে কোন বাধা রহিল না। দেব-দেবীর উপরও তাহাদের ভক্তিশ্রদ্ধার উন্মেষ করা হইল। এই প্রকারে দুই কুলই বজায় রহিল।

প্রসঙ্গতঃ অজ শব্দের অর্থ যেমন ব্রীহি অর্থাৎ বীজ না হইয়া বিকৃত হইয়া ছাগ হইয়াছে; তদ্রূপ আর একটি বিকৃত ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত এইস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। সত্যকাম-নামক জবালা-নন্দন

মাতা জবালাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—হে পূজনীয়ে! আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদভ্যাসের নিমিত্ত গুরুগৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করি, বলুন—আমার গোত্র কি? মাতা বলিলেন—"বহ্বং চরন্তী" বৎস, স্বামীগৃহে অতিথি অভ্যাগতাদির বহু পরিচর্য্যা করিতে করিতে আমি পরিচারিণী অর্থাৎ পরিচর্য্যাশীলাই ছিলাম; ঐ পরিচর্য্যা কার্য্যে ও অন্যান্য গৃহকর্মে সর্বদা ব্যস্ত থাকায় পতির গোত্রাদি জানিবার অবসর পাই নাই এবং জানিবার আবশ্যকতাও বোধ করি নাই; কেননা, তখন আমার যৌবনকাল, আর সেই যৌবনকালে তোমাকে লাভ করিয়াছি; সেই সময় তোমার পিতাও মারা যান; অতএব আমি অনাথা হইয়া পড়ি। তদবস্থায় আমি জানিনা যে, তুমি কোন্ গোত্রীয়"। পরন্তু, আমি জবালা নামে পরিচিত, সেই কারণে তুমি জবালা-নন্দন এবং তোমার নাম সত্যকাম। এই কথাই তুমি তোমার গুরু গৌতম ঋষিকে বলিও। বহ্বং চরন্তী (ছান্দোগ্য উপঃ ১ম ভাগ ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ অঃ)। আমি প্রভুত পরিমাণে অভ্যাগতাদির পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম। অবশ্য গৃহস্থাশ্রমে ব্রাহ্মণ-পত্নীর পক্ষে অভ্যাগত সাধুসজ্জনগণের সেবা করা ধর্মসঙ্গত কার্য্যই বটে; কিন্তু কোন কোন অতি বুদ্ধি পণ্ডিত "বহ্বং চরন্তী" এই বাক্যটির "বহুচরন্তী" এই পদ দুইটির অপব্যাখ্যা করিয়া সত্যনিষ্ঠাব্রতী সতী জবালাকে বহুচারিণী বেশ্যারূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

প্রকৃতির দুইটি নাম—অব্যক্ত ও ত্রৈগুণ্য; ইহার আর একটি নামও "অজা"; সুতরাং অজ শব্দকে প্রকৃতি জাত কোন বীজ বিশেষকে বুঝাইতে আপত্তি কি? অজ শব্দের ব্রীহি অর্থই সমীচীন; বিকৃত অর্থ "ছাগপশু" গ্রহণ করিয়া পশুহত্যা মহাপাপের প্রশ্রয় দেওয়া ও ধর্মকর্মে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া কখনই কর্তব্য নহে। স্বভাবতঃ দুর্বল, কৃশ, স্ত্রী-সম্ভোগ-পরায়ণ, পথ-ভ্রমণ-ক্লেশ-ক্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে মাংস ভোজন পুষ্টিকর বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

মাংসভোজীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৃথা মাংসের পরিবর্তে বলির মাংস ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণা—বলির মাংস মন্ত্রপূত হইয়াছে বলিয়া নির্দোষ, কিন্তু একথা নিতান্ত অলীক। কেননা, বলিতেও নিষ্ঠুরতার পরিচয় আছে। দুই-ই পশুর মাংস, দুই-ই সমগুণ বিশিষ্ট এবং উভয়বিধ মাংসই উত্তেজক ও কামোদ্দীপক। কাঁচা নিমপাতা, পাকা নিমপাতা দুই-ই তিত, দুইরই সমান গুণ। খেজুর কাঁটা কাঁচাই হউক অথবা শুক্‌নাই হউক, বিঁধিলে সমান যন্ত্রণা দেয়।

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চারি বিষয়ে মানুষ আর পশুতে কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু খাদ্য বিষয়ে যে প্রভেদ নাই এমন নহে। মানুষের ভালমন্দ, হিত, অহিত জ্ঞান আছে; বুদ্ধি বিচার্য্য জ্ঞান আছে, সংযম রক্ষার দায়িত্ব আছে, তাহাকে মানবধর্ম রক্ষা করিতে হইবে।

মানুষ হইয়া পশুর ন্যায় উদর সর্বস্ব হওয়া উচিৎ নহে, পশুই পশুর মাংস খায়। শ্রেষ্ঠ মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় পশুধর্ম পালন, পশুখাদ্য গ্রহণ কখনই মানবধর্ম নহে। যে-মন মুক্তির কারণ তাহাকে সর্বদা কলুষ-মুক্ত রাখিতে হইবে।

পশুদিগের মধ্যে নিরামিষ ভোজী পশু অনেক আছে, গো, মহিষ, ছাগ, হরিণ, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি। মাংসভোজী পশুদের সংসর্গে থাকিয়াও ইহারা পশুবধ করিয়া উদর পূরণ করে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহারা পশু হইয়াও জীবহিংসা করে না, আর মানুষ মানুষ হইয়া অকারণে জীব হত্যা করিয়া উদর পূরণ করে, রসনা তৃপ্ত করে; কিন্তু একথা ভাবে না যে, জীবহত্যা করিয়া পাপসঞ্চয় করা কর্তব্য নহে। এই সঞ্চিত পাপের ফলে তাহাকে পরজন্মে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, ইহা অনিবার্য্য।

খাদ্য ও পানীয়ের গুণাগুণ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মাদক-দ্রব্য-সেবনে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়।

রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট খাদ্য, সংযমের বিঘ্ন ঘটায়। কাম ক্রোধ এই দুইটি ধ্বংশকারী রিপু রজোগুণ হইতে উদ্ভূত হয়; সুতরাং ঐ জাতীয় খাদ্য মুক্তিকামীর পক্ষে সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

যাহাই মানুষকে ক্রমবিকাশের দ্বারা পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা অমৃতত্ব লাভ করায় তাহাই ধর্ম, ধর্মজ্ঞান আছে বলিয়াই পশু অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ।

আমাদের হৃদয়ে দয়াবৃত্তি যাহাতে হ্রাস না পায়, খাদ্য বিষয়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জীবহত্যা দ্বারা হৃদয় হইতে দয়া নির্মূল করা মানবধর্ম নহে; ইহা অতি নিষ্ঠুর কর্ম এবং জ্ঞানলাভের পরিপন্থী; কেননা, দয়া হইতে কর্মে কর্তব্যজ্ঞান জন্মে, কর্তব্যজ্ঞান হইতে শ্রদ্ধা ভালবাসা জন্মে। এই শ্রদ্ধা, ভালবাসা সমষ্টিগত হইলে কর্ম নিষ্কাম হয়, নিষ্কাম কর্মই মোক্ষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছু ব্যক্তিদের আত্মার শুদ্ধি একান্ত আবশ্যক। সর্বজীবে দয়াই যখন প্রধান ধর্ম তখন হিংসার আশ্রয় লওয়া কখনই উচিত নহে।

যে বস্তুদ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়, তাহা শুদ্ধ হৃদয়ের নির্মল ভালবাসা। ইহা দ্বারাই মানুষ লাভ করে তাঁহার অনন্য সাধারণ সান্নিধ্য এবং ধন্য হয়। পৃথিবীর আর সকল বস্তুর দ্বারা মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু ভালবাসায় সকল জীব সকল মানুষ সমান। অতএব জীবহত্যা না করিয়া সকল জীবকে নিজ প্রাণতুল্য ভালবাসা দ্বারা হৃদয়কে নির্মল রাখিতে হইবে। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"। এই মহাবাক্য পালন করিলে ঈশ্বরের সান্নিধ্য বা অনুভূতি লাভ করা যায়।

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে সর্বজীবে ভালবাসা, প্রেম, মুখ্য উপায়। ভক্ত প্রহ্লাদ হস্তী পদতলে পড়িয়াও ভগবানকে বলিয়াছিলেন—"প্রভো! তোমার কী অসীম দয়া, যে পদ পাওয়ার জন্য মুনি ঋষিরা কঠোর

তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই কোমল পাদস্পর্শে আমি আজ ধন্য”।

প্রভু রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য বনের পশু বানরদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং জীবহিংসা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব-জীবে দয়া, ভালবাসা ও প্রেম করাই মানবজীবনের কর্তব্য কর্ম।

মনু বলিয়াছেন—(মনু সংহিতা, ৫ম অধ্যায় ২৭ শ্লোক) ব্যাধি-হেতুক বা খাদ্যদ্রব্যের অভাবে প্রাণ যায়—এমন দায় উপস্থিত হইলে মাংস-ভক্ষণ করিতে পারা যায় (৫৭)। জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই ব্রহ্মা জীবের অন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব স্থাবর জঙ্গম—এই উভয়ই জীবগণের ভোক্ষ্য। (২৮) যে-ব্যক্তি অকারণ পশু নাশ করে, সেই অকারণ পশুঘাতী, ঐ পশুর গাত্রে যত রোম আছে ততবার জন্ম গ্রহণ করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। (৩৮)।

যে ব্যক্তি কেবল আত্মসুখের জন্যই হিংসাশূন্য, নিরীহ হরিণাদি পশুর হিংসা করে, সেইব্যক্তি জীবিত বা মৃত—কোন অবস্থাতেই সুখলাভ করে না। যিনি প্রাণীদিগকে বন্ধন-বধাদি দ্বারা কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না ও যিনি সকলের হিতকামী, তিনি অত্যন্ত সুখভোগ করেন। (৪৫, ৪৬)। যিনি কাহাকেও হিংসা করেন না, তিনি যাহা ধ্যান করেন, যে কিছু ধর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং যে বিষয়ে মনোনিবেশ করেন তৎসমুদায়ই অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। (৪৭)। প্রাণী-হিংসা না করিলে কখনও মাংস উৎপন্ন হয় না ; প্রাণী হিংসা স্বর্গজনক নহে ; অতএব মাংস ভোজন করিবে না। (৪৮) মাংসের উৎপত্তি, শরীরীদিগের বধ-বন্ধন-যন্ত্রণা—এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া সর্বপ্রকার মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত থাকিবে। (৪৯) ইহলোকে আমি যাহার মাংস ভোজন করিতেছি, পরলোকে সে আমাকে ভক্ষণ করিবে। পণ্ডিতগণ মাংস শব্দের অর্থ (মাম্—আমাকে, সঃ—সেই ভক্ষণ করিবে)

এইরূপ বলিয়া থাকেন॥ (৬৫)। মাংস ভোজন, মদ্যপান ও মৈথুন বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ হইলেও এই সমুদয় হইতে নিবৃত্ত হওয়াই মহাফলজনক; আত্ম-শুদ্ধি-পথে বিশেষ প্রেরণা যোগায়॥ (৬৬)॥

ব্যক্তিগত পবিত্রতা বা শুদ্ধ আচারকে ধর্ম অপেক্ষা উচ্চতর মনে করা উচিত। এস্থানে ইহাও বলা কর্তব্য এই যে, আচার বলিলে বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার শুদ্ধি বুঝায়। অসৎ সঙ্গত্যাগ, জল এবং অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত বস্তু সংযোগে শরীরের শুদ্ধি-বিধান করা যাইতে পারে। আভ্যন্তর শুদ্ধির জন্য শুদ্ধ আহার গ্রহণ, রজো ও তমো গুণান্বিত আহার্য্য, চৌর্য্য, দ্যূতক্রীড়া, মিথ্যা-ভাষণ এবং অন্যান্য গর্হিত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র-সেবা, বিপন্ন ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে।

শাস্ত্রে খাদ্যে ত্রিবিধ দোষ কথিত আছে, (১) জাতি দোষ, (২) নিমিত্ত দোষ ও (৩) আশ্রয় দোষ। যে সকল আহার্য্য বস্তু স্বভাবতঃই অশুদ্ধ যেমন—রসুন, পেয়াজ ইত্যাদি। জাতিদুষ্ট খাদ্য খাইলে কামের প্রাবল্য হয়। (২) নিমিত্ত দোষ—আবর্জনা, কীটাদিপূর্ণ অপরিষ্কৃত স্থান। (৩) আশ্রয়দোষ—অসৎ ব্যক্তি কর্তৃক রন্ধিত অথবা পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিবে। কারণ, ইহা দ্বারা মনে অপবিত্র ভাব উদিত হয়। এক পংক্তিতে ভোজনেও সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণের আশঙ্কা আছে।

রজোগুণই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও নাশের নিদান। অতএব সেই রজোগুণকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হইবে, ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হইলে দুঃখ নাশ হইয়া যায়। অতএব যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহাকে আর পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। (মহাভারত, শান্তিপর্ব)।

মনু বলিয়াছেন—স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ।

(মনুসংহিতা, ৫ম অধ্যায় ৩৯ শ্লোক)

অর্থাৎ প্রজাপতি স্বয়ং যজ্ঞ কার্য্যের নিমিত্ত পশু সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। ধার্মিক পুরুষেরা যথাশাস্ত্র যজ্ঞাদি ধর্মের উপাসনা করেন কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। কোন কোন মুনি যজ্ঞে পশু হত্যা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে স্বর্গভোগ হইবে ইহারও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন; দেশ কাল-পাত্রভেদে রীতি, নীতি, আচার আচরণের বিপর্য্যয় ঘটে। জীবের একমাত্র লক্ষ্য মুক্তিলাভ করা, কিন্তু যজ্ঞ দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, যেহেতু ইহাতে জীবহিংসার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা সকাম কর্ম।

(মহাভারত—শান্তিপর্ব)

আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্যক। যাহাতে মন খুব পবিত্র থাকে, এরূপ আহার করিতে হইবে। কোন পশুশালার ভিতরে গিয়া দেখিলে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারা যায়, আহারের সহিত শরীরের কি সম্বন্ধ। হস্তী অতি বৃহদাকার জন্তু, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত; আর সিংহ বা বাঘের খাঁচার দিকে গিয়া দেখিলে দেখা যায়—তাহারা অস্থির, চঞ্চল। ইহাতেই বুঝা যায় আহারের তারতম্যে কি ভয়ানক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আমাদের শরীরে যতগুলি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, সবগুলিই আহার হইতে উৎপন্ন, ইহা আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। যদি উপবাস করিতে আরম্ভ করি প্রথমতঃ শরীর দুর্বল হইবে। দৈহিক শক্তি হ্রাস পাইবে কয়েক দিন পর মানসিক শক্তিগুলিও হ্রাস পাইতে থাকিবে। স্মৃতিশক্তি চলিয়া যাইবে, পরে এমন এক সময় আসিবে তখন চিন্তা করিবারও সামর্থ্য থাকিবে না।

যে সকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সমূহের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি বা অনুরাগ আছে অর্থাৎ ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে খাদ্যের প্রকার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু যাঁহারা কোন সাধনা করিতে চাহেন, চঞ্চল মনের স্থিরতা আনিতে

চাহেন, অথবা সংযমী হইতে ইচ্ছা করেন অথবা মুক্তিলাভের পথ অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রথমাবস্থায় আহার সম্বন্ধে যত্ন লওয়া উচিত। যতদিন পর্য্যন্ত না মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ হইতেছে, ততদিন আহার সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। মন সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আসিলে পর, ইচ্ছামত খাইতে পারা যায়। চারাগাছ যতদিন বাড়িতে থাকে, ততদিন উহাকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়; বড় হইলে বেড়া সরাইয়া ফেলা হয়; কেননা, তখন সকল প্রকার আক্রমণ—অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা উহার হইয়াছে।

"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ॥"

(ছান্দোগ্য উপঃ ৭।২৬।২)।

ইহার অর্থ এই যে আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে মেধা শক্তি বাড়ে, স্মৃতিশক্তি স্থায়ী হয়। রামানুজ এই "আহার" শব্দ খাদ্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে আহার-শুদ্ধি আমাদের জীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। তিনি বলেন জাতিদোষ, নিমিত্ত দোষ ও আশ্রয় দোষ এই ত্রিদোষে খাদ্য অশুদ্ধ হয়। এই ত্রিবিধ দোষ বর্জ্জিত হইলে খাদ্য শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ আহার করিলে সত্ত্ব শুদ্ধ হয় অর্থাৎ মন শুদ্ধ হয়; মন শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা ঈশ্বরের স্মরণ মনন অব্যাহত থাকে।

শঙ্করাচার্য্য ঐ বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ করিয়াছেন। "আহ্রিয়তে" ইতি আহারঃ। তিনি বলেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমুদয়ই আহার। রাগ-দ্বেষ-মোহরূপ ত্রিবিধ দোষ বর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ গ্রহণ করাকেই আহারশুদ্ধি বলে। তখন মন রাগ-দ্বেষ-মোহ বর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ হয়। এইরূপে সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়; তখন ঈশ্বরের স্মৃতি অচল ও অব্যাহত থাকে।

শঙ্করাচার্য্যের মতে "আহার" অর্থে—ইন্দ্রিয়-লব্ধ বিষয়-জ্ঞান।

রামানুজের মতে "আহার" অর্থে—ভোজ্যদ্রব্য।

ব্যাখ্যা দুইটি আপাত বিরোধী বলিয়া বোধ হইলেও উভয়ই সত্য ও প্রয়োজনীয়। সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ মনের সংযম, স্থূল শরীরের সংযম হইতে উচ্চতর কাজ বটে, কিন্তু সূক্ষ্মের সংযম করিতে হইলে অগ্রে স্থূলের সংযম বিশেষ আবশ্যক। অতএব গুরু পরম্পরা যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে তাহা পালনীয়।

"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ" এই বাক্যটি লইয়া ভাষ্যকারদিগের মধ্যে মহা বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের ধারণা বিশুদ্ধ গুণই সত্ত্বগুণ, তাহা আবার শুদ্ধ করা যায় কি প্রকারে? যেমন একখানা গোলটেবিলকে আবার গোল করা যায় কি প্রকারে?—এই মতবাদগুলি মীমাংসার জন্য এখানে প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইল। কেহ যেন ইহাকে ধান ভান্‌তে শিবের গীত মনে না করেন।

সত্ত্ব শব্দের অর্থ কি? সাংখ্য দর্শন মতে এবং ভারতীয় সকল দর্শন-সম্প্রদায়ই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দেহ ত্রিবিধ উপাদানে (ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ) গঠিত হইয়াছে, ত্রিবিধ গুণে নহে। সাধারণ ধারণা —সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনটি গুণ, কিন্তু তাহা নহে; উহারা জগতের উপাদান কারণ। আর আহার শুদ্ধ হইলে সত্ত্ব-পদার্থ নির্মল হইবে। শুদ্ধ সত্ত্ব লাভ করাই বেদান্তের অন্যতম বিষয়বস্তু।—(স্বামী বিবেকানন্দ)

"ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেক" এই অধ্যায়ের সার মর্ম এই যে, তাহার বিবেক তাহাকে যে পথের অনুসন্ধান দিবে, সে সেই পথই বাছিয়া লইবে। সেই পথের উপযোগী খাদ্য তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। যতী, ব্রতী, মুক্তিকামী ইঁহাদের পক্ষে আহার শুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। ইঁহারা ব্যতীত, সাধারণ গৃহীও যদি চরিত্রবান হইয়া জীবন সুষ্ঠু ও নির্মলভাবে অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার পক্ষেও আহার-শুদ্ধির আবশ্যক। কেবল মাত্র আহার শুদ্ধিই যেন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য

না হয়। মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব লাভ করিয়া আত্মার ক্রম বিকাশ সাধন করিতে হইবে। সর্বজীবে দয়া, পরোপকার, সংযম ইত্যাদি মানবীয় সদ্‌গুণগুলির অধিকারী হইতে হইবে।

: ১০ :

প্রকৃতি পুরুষ

প্রকৃতি কি? প্রকরোতি ইতি প্রকৃতি অথবা যাহা নিত্য আছে তাহার প্রকৃত রূপই প্রকৃতি (Reality)। যে সকল উপাদানে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে তাহার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি নিত্য, অব্যয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অতীত। প্রকৃতি আদি মধ্য হীন, মহত্তের পর এবং ধ্রুব। প্রকৃতির আদি অন্ত নাই; ইহা অতি সূক্ষ্ম ও অলিঙ্গ এবং নিরবয়ব। ইহারই পরিণামে এই বিপুল বিচিত্র জগৎ।

প্রকৃতির একটি নাম—অব্যক্ত। তাহার অভিপ্রায় এই যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অব্যক্ত (Unmanifest) অবস্থায় থাকে। অব্যক্তের ব্যক্ত অবস্থার নাম সৃষ্টি। অর্থাৎ প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয় এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের তিরোভাব হয় অব্যক্ত প্রকৃতিতে।

প্রকৃতির আর একটি নাম—'অজা'। তাহার কারণ এই যে, প্রকৃতির পরিণাম হইয়া রূপান্তর হয় মাত্র। প্রকৃতির উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, ইহা সদ্ বস্তু, ইহার কেবল অবস্থান্তর ঘটে। সমস্ত গুণ ও বিকার প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হয়। প্রকৃতিই জগতের মূল বা অদ্বিতীয় উপাদান। Nature does nothing without a purpose, উদ্দেশ্য ব্যতীত প্রকৃতি রূপান্তর গ্রহণ করে না।

প্রকৃতির আর একটি নাম ত্রিগুণা। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা। যেমন জীবদেহে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন বিরোধী ধাতু সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতেছে সেইরূপ জগতের মূল উপাদান প্রকৃতিতে এই তিন বিরোধী গুণ একে অন্যকে পরাভূত করিবার জন্য সদা প্রস্তুত রহিয়াছে। এই সংগ্রামে কখন সত্ত্ব বিজয়ী হইয়া সুখ বা লঘুতা উৎপাদন করিতেছে, কখনও রজঃ প্রবল হইয়া প্রবৃত্তি বা দুঃখ বা চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে, আবার কখনো বা তম প্রবল হইয়া জড়তা বা গুরুত্ব বা মোহ উৎপাদন করিতেছে; ফলতঃ এই তিনটি গুণ প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ, তিনটি বিরোধী প্রবণতা (Tendency)। প্রলয় কালে এই তিনগুণ সাম্যাবস্থায় থাকে অর্থাৎ এই তিনটি গুণ প্রত্যেকে সমান বলে বলীয়ান থাকাতে কেহ কাহারও পরাভব ঘটাইয়া প্রবল হইতে পারে না। প্রকৃতি জড় অর্থাৎ অচেতন হইলেও পুরুষের ভোগ বা মোক্ষ সাধনের জন্য স্বতঃই জগৎ সৃষ্টি করে কিন্তু সে সৃষ্টি নিজের জন্য নহে পরের জন্যই। আপত্তি হইতে পারে যে, অচেতন প্রকৃতি কিরূপে সৃষ্টি কার্য্যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইতে পারে। যেমন—দুগ্ধ স্বতঃই দধিরূপে পরিণত হয়; অথবা এক ঋতুর পর আর এক ঋতু স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হয়; প্রকৃতির পরিণামও তদ্রূপ (সাংখ্যমতে)। জগতের প্রত্যেক বস্তুই ত্রিগুণের সমবায়ে গঠিত। মনুষ্য দেহেও উপভোগ্য এই তিনগুণ আছে; কেহ সুখকর (সত্ত্ব), কেহ দুঃখকর (রজঃ) কেহ মোহকর (তম)। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা ঐ ত্রিগুণ হইতে মুক্ত। পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপী, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব।

প্রকৃতি জড়, (অচেতন), পুরুষ চেতন।

প্রকৃতি পরিণামী, পুরুষ নির্বিকার।

প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ নির্গুণ (গুণাতীত)।

প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা

প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ ভোক্তা

প্রকৃতি বিষয় (Object), পুরুষ বিষয়ী (Subject)।

পুরুষ সুখ দুঃখের অতীত, নিত্যমুক্ত ও অসঙ্গ।

পুরুষ অকর্তা ও অপরিণামী।

পুরুষ দেহসংযুক্ত হইয়াও নিষ্ক্রিয় ও নির্লেপ।

প্রকৃতি অচেতন অতএব অন্ধ স্থানীয়।

পুরুষ অকর্তা অতএব পঙ্গুস্থানীয়। উভয়ে সংযুক্ত হইয়া একে অন্যের অভাব পুরণ করে, ফলে সৃষ্টি সাধিত হয়।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য—পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সাধন। যেমন একমাত্র সূর্য্য সমস্ত লোক প্রকাশিত করে তদ্রূপ একমাত্র পুরুষ সমস্ত ক্ষেত্রে (প্রকৃতিতে) নিজেকে প্রকাশিত করেন। প্রকৃতি পুরুষ সংসর্গে চৈতন্য-ধর্মী হয়। পুরুষ অর্থে পরমাত্মা।

প্রকৃতি নিজের মধ্যে পুরুষের ভাবসমুদয় প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃতি হইতেই ধর্মাধর্ম যুক্ত সমস্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে। যেমন একটি দীপ হইতে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হয় সেইরূপ একমাত্র প্রকৃতি হইতে সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি অসীম তজ্জন্য উহার নাশ হয় না। সূক্ষ্ম স্বরূপ ঈশ্বর হইতে কর্মজ বুদ্ধি জন্মে; ঐ বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই আটটি পদার্থ সকলের মূলে রহিয়াছে; ঐ অষ্টধা প্রকৃতি হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয় ও মন উৎপন্ন হইয়াছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে

মন সর্বদা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মনই ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া সব কিছু গ্রহণ করে, সুখ দুঃখ ইত্যাদি অনুভব করে।

আত্মা নবদ্বার বিশিষ্ট এই দেহে অবস্থান করিয়া আছেন। এই নিমিত্ত উহাকে দেহী বা পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করা হয়; তিনি জরা বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা বর্জিত ও অমর। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে কার্য্যে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি সর্বব্যাপী গুণ-সমন্বিত ও সূক্ষ্ম এবং তিনিই সকল প্রাণীর গুণকে বা বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। প্রদীপ যেমন ক্ষুদ্র বৃহৎ হ্রস্ব বা দীর্ঘ যাহাই হউক সমস্ত বস্তু প্রকাশ করে, সেইরূপ পুরুষ উপাধিভেদে মহৎ অথবা হীন সকল প্রাণীতেই জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করেন। এই দেহই তাঁহার শব্দাদি বিষয় অনুভূতির কারণ; কিন্তু তিনি সকল কার্য্যের কর্ত্তা। কাষ্ঠ ভেদ করিলে সেই কাষ্ঠস্থিত বহ্নি যেমন পরিদৃশ্যমান হয় না সেইরূপ শরীর ছেদন করিলে শরীরে অবস্থিত আত্মার দর্শন লাভ হয় না। আর কৌশলক্রমে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে যেরূপ তন্মধ্যস্থিত অগ্নি নিষ্কাশিত ও প্রত্যক্ষীভূত হয়, তদ্রূপ যোগবল আশ্রয় করিলে দেহমধ্যস্থিত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

প্রকৃতির সহিত পুরুষের যেরূপ সম্বন্ধ, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধও তদ্রূপ। পুরুষ সহযোগ বা সংস্রব ব্যতীত স্ত্রীজাতি গর্ভধারণে অক্ষম এবং স্ত্রীজাতি ব্যতীত পুরুষ সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ। ঋতুকালে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সহযোগিতায় সন্তান-সন্ততি সমুৎপন্ন হয়। বেদ, স্মৃতি, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, পিতা হইতে অস্থি, স্নায়ু নখ কেশ এবং মাতা হইতে ত্বক, মাংস ও শোণিত মজ্জা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

মনুষ্যদেহে ত্বক, মাংস, রুধির, মেদ, পিত্ত, অস্থি, মজ্জা স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়াদি সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি হয় তদ্রূপ ত্বক হইতে ত্বক প্রভৃতির, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ের এবং দেহ

হইতে দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরমপুরুষের বীজ, ইন্দ্রিয় বা দেহ নাই; সুতরাং গুণ থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? বায়ু আকাশ প্রভৃতি যেমন ত্বক প্রভৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আবার ঐ সমুদয়ে বিলীন হয়, তদ্রূপ ত্বক প্রভৃতি প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আবার প্রকৃতিতেই লয়প্রাপ্ত হয়। পুরুষের শুক্র ও নারীর রজঃ সহযোগে ত্বক, মাংস, মেদ, রুধির, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ু-যুক্ত দেহ সমুৎপন্ন হয়। এ সকলের মূল উপাদানের যোগানদার প্রকৃতি। অতএব কেবল প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

জীবাত্মা ও জগৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ে লিপ্ত হইয়া আছে; কিন্তু পরমাত্মা জীবাত্মা ও জগৎ হইতে পৃথক। যেমন ঋতু-সমুদয় মূর্ত্তিবিহীন হইয়াও ফল, পুষ্প দ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি আকৃতিশূন্য হইয়াও আত্মসম্ভূত মহৎ প্রভৃতি গুণ দ্বারা অনুমান গোচর হয়। সেইরূপ কেবল দেহস্থিত চৈতন্য দ্বারাই হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি বিকারশূন্য, চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত নির্মল পরমাত্মার অনুমান করা যায়। আদি-অন্তহীন সমদর্শী, নিরাময় আত্মা কেবল দেহ প্রভৃতির অভিমান বশতঃই সগুণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা সগুণ পদার্থের সহিত গুণের সম্বন্ধ আছে কিন্তু নিগুর্ণ পদার্থের সহিত গুণের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারাই যথার্থ গুণদর্শী।

জীবাত্মা কাম, ক্রোধ প্রভৃতি প্রাকৃতিক গুণসমুদয়কে জয় করিতে পারিলেই দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক পরমাত্মার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হন।

প্রকৃতি হইতেই সমুদয় জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। সূর্য্য অস্তগমনকালে স্বীয় কিরণজাল নিজের দিকে টানিয়া লইয়া যায় এবং উদয়কালে পুনরায় ঐ সকল কিরণ প্রসারণ করেন, তদ্রূপ জগদীশ্বর প্রলয়কালে গুণসমুদয় সংহার করিয়া একাকী অবস্থান পূর্বক

সৃষ্টিকালে পুনরায় অতি মনোরম বিবিধ গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বারংবার এইরূপ জগতের সৃষ্টি ও সংহার করা তাঁহার ক্রীড়ামাত্র।

সনাতন পরমব্রহ্ম গুণাতীত হইয়াও সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারিণী সনাতনী ত্রিগুণা প্রকৃতির সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন। প্রকৃতির প্রভাবেই এই জীবজগৎ মুগ্ধ ও সর্বদা সুখ দুঃখে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। জীবভূতা প্রকৃতিই এই ত্রিলোকমধ্যে শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহার ফলভোগ করে।

তির্য্যকলোক, মনুষ্যলোক ও দেবলোক এই তিন লোকই প্রকৃতির কার্য্যের প্রকটিত রূপ। প্রকৃতির যেমন কোন চিহ্ন নাই, কেবল মহদাদি কার্য্যের দ্বারা উহার অনুমান করা যায়, তদ্রূপ পুরুষেরও কোন চিহ্ন নাই, কেবল দেহস্থিত চৈতন্যদ্বারা উহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার পুরুষ (জীবাত্মা) প্রকৃতিদ্বারা প্রবর্তিত হইয়া শরীর ধারণ করে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদয় সত্ত্বাদি গুণসহযোগে বিবিধ কর্ম্মবিষয়ে পরিচালিত হয়।

সমুদয় প্রকৃতি আত্মার জন্য, আত্মা প্রকৃতির জন্য নহে। আত্মার শিক্ষার জন্যই প্রকৃতির প্রয়োজন। আত্মা যাহাতে জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং জ্ঞানের দ্বারাই আত্মা নিজেকে মুক্ত করিতে পারে—ইহাই প্রয়োজন। প্রকৃতির গতি কখনও বন্ধ থাকে না। প্রকৃতিতে যত বস্তু আছে, যাহাকিছু আমরা দেখিতেছি—সবই এই তিনশক্তির (সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ) বিভিন্ন সমবায়ে উৎপন্ন। সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে নানা তত্ত্বে বিভক্ত করিয়াছেন; মনুষ্যের আত্মা ইহাদের সবগুলির বাহিরে, প্রকৃতির বাহিরে। আর প্রকৃতিতে যে কিছু চৈতন্যের প্রকাশ দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃতির উপরে আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রকৃতি বলিতে উহার সহিত মনকেও বুঝাইতেছে। মনও প্রকৃতির ভিতরে। চিন্তাও প্রকৃতির অন্তর্গত—প্রকৃতির বিভিন্ন

বিকাশমাত্র। প্রকৃতি মনুষ্যের আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে; যখন প্রকৃতি ঐ আবরণ সরাইয়া লয়, তখন আত্মা স্ব-মহিমায় প্রকাশিত হন। আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। প্রকৃতির নিজের কোন শক্তি নাই। যতক্ষণ পুরুষ উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণই তাহার শক্তি প্রতীয়মান হয়, চন্দ্রে আলোক যেমন তাহার নিজের নয়, প্রতিফলিত—প্রকৃতির শক্তিও তদ্রূপ। প্রকৃতি একটি মিশ্র পদার্থ, উহা সাক্ষীস্বরূপ পুরুষের জন্য এইসকল বিচিত্র দৃশ্য দেখাইতেছে।

: ১১ :

দৈব ও পুরুষকার

(পুরুষকার অর্থে—দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া নিজ শক্তি প্রয়োগ—পৌরুষ, প্রচেষ্টা, উৎসাহ, Struggle)।

বীজ ব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন বা কোন ফল লব্ধ হয় না। বীজ হইতে বীজ এবং বীজ হইতে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন কৃষকেরা ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে তাহাদিগের তদনুরূপ ফল লাভ হয়; তদ্রূপ মানবগণ ধর্ম ও অধর্ম এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের তদনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্র ভিন্ন স্থানান্তরে বীজ বপন করিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না, তদ্রূপ পুরুষকার ব্যতীত দৈব কখন সুসিদ্ধ হইবার নহে।

পুরুষকার ক্ষেত্র, দৈব বীজ।

ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ের একত্র সমাবেশ হইলেই ফল সমুৎপন্ন হয়। মানবগণ যে শুভ কার্য্যের বলে সুখ এবং পাপকর্ম প্রভাবে দুঃখ ভোগ করে ইহলোকেই তাহার প্রমাণও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কর্মের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই তাহার ফল লাভ হয়; কিন্তু কর্ম

অনুষ্ঠান না করিলে কিছুমাত্র ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। কর্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে কিছুই দুর্লভ থাকে না; কিন্তু কর্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দৈববল অবলম্বন করিলে কিছুই লাভ হয় না। একমাত্র পুরুষকার প্রভাবে স্বর্গ ভোগ, সদাচার ও মনের উচ্চভাব প্রভৃতি সমুদয় লাভ করিতে পারা যায়। দৈব অথগুনীর। দৈবের প্রভাবে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসী হইয়া সীতার জন্য মনস্তাপ ভোগ করিয়াছিলেন; ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও পত্নী দ্রৌপদী সহ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। কৃপণ, অলস, নিষ্কর্মা, কুকর্মা, পরাক্রমহীন, উদ্যমহীন ব্যক্তিরা সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ভগবান বিষ্ণু ত্রিলোক সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিও স্বয়ং তপানুষ্ঠান করেন। যদি কর্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলোদয় না হইত, তবে কেহই কর্মের অনুষ্ঠান করিত না; সকলেই একমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। দৈব বিরুদ্ধ হইলে ইহলোকে নানাবিধ দুরবস্থা উপস্থিত হয়। কিন্তু পুরুষকারের হানি হইলে পরকালে অশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে। কর্মানুষ্ঠান ভিন্ন দৈব স্বয়ং কখন কিছুমাত্র প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবলোকেও স্থান-সমুদয় অনিত্য, তখন দেবতারাও যে কর্মের অধীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। দেবগণ মহর্ষিগণের তপস্যার বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু মহর্ষিগণও তপোবলে দেবগণকে পরাভূত করিয়া থাকেন। এইরূপে যদিও পুরুষকারের প্রাধান্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে তথাপি দৈবকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করা বিধেয় নহে। দৈব, লোকের কর্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কারণ। লোকে দৈব প্রভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট ফলভোগ করে।

যাহা হউক, কেবলমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

আত্মাই মনুষ্যদিগের বন্ধু ও শত্রু। আত্মাই মানব দিগের সৎকর্ম্ম ও অসৎ কর্ম্মের স্বাক্ষিস্বরূপ। মানুষের পুণ্যকর্ম্মের ফলে দৈব পরাভূত হয়।

১। মহারাজ যযাতি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াও পুণ্যবান দৌহিত্রগণ কর্ত্তৃক পুনরায় স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

২। রাজর্ষি পুরুরবা ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে স্বর্গে গিয়াছিলেন।

৩। কোশলাধিপতি মহারাজ সৌদাস কর্ম্মদোষে বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষসত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

৪। মহাধনুর্দ্ধর পরশুরাম কর্ম্মদোষে স্বর্গে স্থান পান নাই।

৫। চেদিরাজ বসু একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও একটি মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করায় ভূতলে গিয়াছিলেন।

৬। মহর্ষি বৈশম্পায়ন অজ্ঞান বশতঃ বালক হত্যা ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন তথাপি দৈব তাঁহাকে দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। লোভ মোহের বশীভূত নরাধম দিগকে দৈব কখনই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অল্পমাত্র অগ্নি বায়ু সংযোগে প্রবল হইয়া উঠে তদ্রূপ দৈব পুরুষকার দ্বারা সংযুক্ত হইলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হয়। যেমন তৈল ক্ষয় হইলে দীপ শিখার হ্রাস হয়, তদ্রূপ কর্মক্ষয় হইলে দৈবের হ্রাস হইয়া থাকে। কর্মবিহীন ব্যক্তিরা দৈববলে কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। যাহারা কুপথে পদার্পণ করে দৈব পুরুষকারের সাহায্য ব্যতীত কদাচ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না। দৈবের প্রভাব প্রকাশ পায় পুরুষকারের সাহায্যে। যেমন শিষ্য গুরুর অনুসরণ করে তদ্রূপ দৈব সর্বদা পুরুষকারের অনুসরণ করে। লোকে পূর্বকৃত সৎকর্মের ফলে দৈবের গুণে ঐহিক সুখ লাভ করে। ইহলোকে শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম করিলে কর্মের প্রভাবে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। বৎস যেমন সহস্র সহস্র ধেনু মধ্যে আপনার জননীর নিকট গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্বজন্মকৃত কর্ম জন্মান্তরে কর্ত্তাকেই আশ্রয় করে। যেমন পুষ্প ও ফল নিজের স্বভাব বশতঃ যথাসময়ে বিকশিত ও সুপক্ক হয়, তদ্রূপ পূর্বজন্মকৃত

কার্য্যসমুদয় প্রকৃত সময়ে ফল প্রদান করে। পুরুষকার ও দৈব—দুইই প্রধান। কৃষক ক্ষেত্র কর্ষণ করিল কিন্তু বৃষ্টির অভাব, আবার বৃষ্টি যথাসময়ে হইল কিন্তু কৃষক অলস, কর্ষণ করিল না, সুতরাং ফল পাইল না। তবে বৃষ্টি না হইলেও কৃষক পুরুষকারের বলে জলসিঞ্চন দ্বারা কতকটা ফললাভ করিবে সন্দেহ নাই। অতএব উদ্যম চাই, চেষ্টা চাই, নিরলস কর্ম চাই। দৈব ও পুরুষকার পরস্পরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। উদারস্বভাব পুরুষেরা ঐ উভয়ের মধ্যে পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন; আর অসার ব্যক্তিরা দৈবকেই বলবান জ্ঞান করিয়া প্রতিনিয়ত উহার উপাসনা করিয়া থাকে। যে কার্য্য আপনার হিতকর তাহা তীক্ষ্ণ হউক বা মৃদুই হউক তাহার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কার্য্যবিহীন অজ্ঞান লোকদিগকে সর্বদা নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। অতএব দৈব অবলম্বন না করিয়া উদ্যম সহকারে কার্য্য করাই বিধেয়। মানবগণ সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিতজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। বিদ্যা, শৌর্য্য, দক্ষতা, বল ও ধৈর্য্যই লোকের সহজ মিত্র। লোকে ঐ সমুদয়ের প্রভাবেই সুখে জীবন যাপন করিতে পারে। প্রাজ্ঞ পুরুষেরা সর্বস্থানেই গৃহ, তাম্রাদি ধাতু, ক্ষেত্র, ভার্য্যা ও সুহৃদ্ লাভ করিয়া পরমসুখে কাল যাপন করিতে সমর্থ হবেন। কার্য্যদক্ষ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অল্প অর্থ থাকিলেও তাহা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। কার্য্যদক্ষ না হইলে অর্থবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। যে পুরুষের পৌরুষ দ্বারা দৈবকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আছে তিনি দৈব নিবন্ধনে বিপন্ন হইয়াও কখনও অবসন্ন হন না। অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত হন না। নরেশ চন্দ্রের একটি গীত আছে—

"কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে (মা)
জয় দুর্গা শ্রী দুর্গা বলে কেন ডাকা তবে?"

ঃ ১২ ঃ

"দুঃখ নিবৃত্তির উপায়"

১। দিবা-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি যেমন আছে সুখ-দুঃখও তেমনি আছে। এই দুঃখ নিবারণের জন্য অনাদিকাল হইতে শাস্ত্রকারেরা নানা প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা যেমন ছিল তেমনিই রহিয়াছে। এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির উপায় একমাত্র ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করা। জগৎকে যেভাবে দেখা যায় সেইভাবে লইলে সংসারে দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের পশ্চাতে উহার অতীত প্রদেশে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছেন। সেই অনন্তকে বেদান্ত ব্রহ্ম বলিয়াছেন। সেই ব্রহ্মকে না জানা পর্যন্ত দুঃখের অবসান নাই। কিন্তু সেই ব্রহ্মকে জানিবার উপায় কি?

বেদান্ত বলেন—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,' আমরা জগৎ সংসারকে যেভাবে দেখি তাহা যদি মিথ্যা হয়, তাহা যদি অসত্য হয় তবে সত্য বস্তুর সন্ধান করিতে হইবে। অসত্য বলিয়া যদি এই সংসার ত্যাগ করিতে হয় তবে জীবনত্যাগ করিতে হয়; আত্মহত্যা করিতে হয়। তবে আর জীবনের থাকিল কি? একটা মশা একটি লোকের মাথায় বসিয়াছিল। তাহার এক বন্ধু ঐ মশাটাকে মারিবার জন্য তাহার মস্তকে এমন জোরে আঘাত করিল যে লোকটিও মরিল মশাও মরিল।

যে জগৎকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, উপভোগ করিতেছি, সে জগৎ অসত্য, ইহা ধারণাতীত। তাই শাস্ত্রের উপদেশ যে, জগৎকে ব্রহ্মভাবে দেখিতে হইবে। তাহা হইলে কোন ভ্রমই থাকিবে না, জগৎ মিথ্যা বা অসত্য বলিয়া বোধ হইবে না।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" (ঈশা উপঃ—১ম শ্লোক) অর্থাৎ সকল বস্তুতে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। সংসার ত্যাগ

কর” অর্থে—স্ত্রী ত্যাগ কর, সন্তান-সন্ততি ত্যাগ কর ইত্যাদি। তাহা হইলে তাহারা যাইবে কোথায়? কি খাইয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে? তাহা নহে, ইহা তো পৈশাচিক কাণ্ড, ইহা তো ধর্ম নহে। ইহার প্রকৃত অর্থ হইল এই যে,—স্ত্রীর মধ্যে, সন্তান-সন্ততির মধ্যে ঈশ্বর দর্শন কর। আমরা যে দুঃখবোধ করিয়া থাকি, বাসনা হইতে তাহার উৎপত্তি। তোমার কিছু অভাব আছে, আর সেই অভাব পূর্ণ হইতেছে না বলিয়া দুঃখ আইসে। অভাব যদি না থাকে তবে দুঃখ আসিবে না। যখন আমরা সকল বাসনা ত্যাগ করিব তখন কি হইবে? ঐ প্রস্তর খণ্ডের কোন বাসনা নাই সত্য, উহা কোন দুঃখবোধ করে না। কিন্তু কোন উন্নতিও করে না, যে প্রস্তর সেই প্রস্তরই থাকিয়া যায়। যদি বাসনা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি সত্য বলিয়া মনে হয়, তবে বাসনা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু বাসনা ত্যাগ করিলে দেহরক্ষা হইবে কিরূপে? জীবনে উন্নতিলাভ হইবে কিরূপে? আমরা জীবনে যে পথে চলি, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন যেভাবে গঠন করিতে ইচ্ছা করি তাহা তো সবই বাসনার উপর নির্ভর করে। বাসনা ত্যাগ অর্থে বাসনাকে সংহার কর, তার সঙ্গে বাসনাযুক্ত মানুষকে মারিয়া ফেল—তাহা নহে। তুমি যে বিষয় আশয় রাখিবে না, কোন জিনিষের অভাব মনে করিবে না তাহা নহে। যাহা কিছু তোমার আবশ্যক, এমনকি তদতিরিক্ত জিনিষ পর্যন্ত তুমি রাখিতে পার, প্রসাধন দ্রব্যাদিও রাখিতে পার, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, তোমায় সত্যকে জানিতে হইবে। তোমার যাহা যাহা আছে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে, কিছুই তোমার নয়, সকলই সেই ঈশ্বরের। কোন দ্রব্যে স্বামীত্বের ভাব রাখিও না। তোমার ভোগ্য ধনে, তোমার মনে, তোমার বাসনায়, তোমার বস্ত্রে, তোমার অলংকারে, তোমার গতি-বিধিতে, তোমার কথাবার্ত্তায়, তোমার শরীরে, তোমার চেহারায়, তোমার স্ত্রীতে, তোমার স্বামীতে,

তোমার সন্তান সন্ততিতে, তোমার ভালোতে-মন্দতে, জীবনে-মরণে, খাদ্য-অখাদ্যে, নরে-পশুতে, পাহাড়ে-পর্বতে, নদীতে-সমুদ্রে, শ্মশানে-মশানে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র তিনি। সুখেও তিনি, দুঃখেও তিনি।

"সংসার ত্যাগ কর"—এই উপদেশ অনুসারে যদি সমুদয় বাসনা ত্যাগ করিতে হয় তবে ইহার ফল দাঁড়াইবে—

আমাদের কোন কাজ করিবার দরকার নাই।
অলস হইয়া বসিয়া থাক;
আহার্য, পানীয় সংগ্রহের আবশ্যক নাই,
কোন চিন্তা করিবারও দরকার নাই।
অদৃষ্টবাদী হইয়া থাক।
প্রকৃতির নিয়মে চল।
শীতে কাঁপ, বৃষ্টিতে ভেজ ক্ষতি নাই।

বাসনা ত্যাগ, সংসার ত্যাগের—প্রকৃত অর্থ এই যে,—সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। তোমার যতকিছু বাসনা আছে ভোগ করিয়া লও; কেবল উহাদিগকে ব্রহ্ম স্বরূপে দর্শন কর। যে ব্যক্তি সত্য না জানিয়া সংসারে বিলাস-বিভ্রমে নিমগ্ন হয় বুঝিতে হইবে সে সত্যের সন্ধান পায় নাই।

অপরদিকে যে ব্যক্তি সংসার অসার মনে করিয়া বনে যায়, সে নিজের শরীরকে কষ্ট দেয়। ধীরে ধীরে শুকাইয়া নিজেকে মারিয়া ফেলে, নিজের হৃদয়কে শুষ্ক মরুভূমি করিয়া তোলে, নিজের সকল মনোভাব বিনাশ করে, সেও সত্যের সন্ধান পায় নাই।

ঈশ্বরকে পাইতে হইলে বাহিরে কোথাও যাইতে হইবে না। তিনি নিজেই দয়া করিয়া প্রত্যেক জীবদেহে আত্মারূপে প্রবেশ করিয়াছেন। আত্মারূপে তাঁহাকে দর্শন কর, পাইবে। আবার তিনি বাহিরেও আছেন অর্থাৎ বাহিরের সকল বস্তুতে ব্রহ্মরূপে আছেন। আগাগোড়া শুনিয়া

আসিতেছি সবই ব্রহ্ম। আমি রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি, সকল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান। একজন বলবান্ লোক আসিয়া আমায় ধাক্কা দিল, অমনি চিৎপাত হইয়া পড়িলাম, ঝাঁ করিয়া উঠিলাম, রক্ত মাথায় চড়িয়া গেল—মুষ্টি বদ্ধ হইল, বিচার শক্তি হারাইলাম। স্মৃতি ভ্রংশ হইল—সেই ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বর না দেখিয়া আমি ভূত দেখিলাম।

মনুষ্যজীবনে একটা আদর্শ থাকা চাই। আদর্শহীন মানুষকে তাহা জীবনের অন্ধকারময় পথে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয়। সেই আদর্শ হইল ব্রহ্মচিন্তা, এই আদর্শ সম্বন্ধে যত পার শুনিতে হইবে। এই আদর্শ অন্তরে, মস্তিষ্কে, শরীরের প্রতি অণু-পরমাণুতে, প্রতি শোণিতবিন্দুতে প্রবেশ করতঃ যাহাতে হৃদয় ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয় তাহাই করিতে হইবে। মনকে সেই ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখ, দিনের পর দিন ঐ সকল ভাব শুনিতে থাক। প্রথম প্রথম সফল না হও, ক্ষতি নাই। এই বিফলতা স্বাভাবিক, ইহা মানুষের সৌন্দর্য্য স্বরূপ। বার বার অকৃতকার্য্য হও ক্ষতি নাই, ধৈর্য্য ধর, সহস্র বার চেষ্টা কর, বিফল হও—আর একবার চেষ্টা কর। সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম দর্শনই মনুষ্যজীবনের আদর্শ। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে শোন, মনে সর্বদা চিন্তা কর ও তাঁহারই ধ্যান কর, অবশ্যই সফল হইবে। যদি শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাঁহার অনুভূতি তোমার অন্তরে না জাগে, তবে অন্ততঃ যাহাকে তুমি শ্রদ্ধার সহিত সর্বাপেক্ষা ভালবাস এমন এক ব্যক্তির ভিতরে তাঁহাকে দর্শন করিবার চেষ্টা কর। তারপর আর এক ব্যক্তিতে—এইভাবে অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া অগ্রসর হইয়া চেষ্টা করিলে তোমার কামনা পূর্ণ হইবে।

আমাদের সমুদয় দুঃখ অজ্ঞানতা বশতঃ। ঐ অজ্ঞানতা আর কিছুই নয়—এই বহুত্বের ধারণা, অর্থাৎ আমরা জগৎকে মনুষ্য পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ দেখি। আমাদের ধারণা যে, মানুষে মানুষে পার্থক্য, নর-নারী ভিন্ন, যুবা-শিশু

ভিন্ন, জাতি-জাতি পৃথক, পৃথিবী চন্দ্র হইতে পৃথক, চন্দ্র সূর্য হইতে পৃথক ইত্যাদি এই জ্ঞানই বাস্তবিক সকল দুঃখের কারণ। এই প্রভেদ বাস্তবিক নহে। উপরে উপরে এই প্রভেদ দেখা যায় মাত্র। বস্তুর অন্ত-স্তলে সেই একত্ব বিরাজমান। যিনি সকল বস্তুতে ব্রহ্মস্বরূপ দেখেন, নিজেকেও ব্রহ্মস্বরূপ দেখেন তাহার আর কোন মোহ থাকে না। তিনি তখন সেই একত্বে পৌঁছিয়াছেন, যাঁহাকে ঈশ্বর বলা হইয়া থাকে। তিনি সকল বস্তুতে সত্য জানিয়াছেন। তিনি আর কি বাসনা করিবেন? তিনি সকল বস্তুর মধ্যে প্রকৃত সত্য অন্বেষণ করিয়া ঈশ্বরে পৌঁছিয়াছেন। তিনি অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দলাভ করিয়াছেন।

বহির্জগতে আমরা যাহা কিছু সৃষ্ট পদার্থ দেখিতে পাই, সবগুলিই ঈশ্বরের অন্তরে নিহিত ছিল, এগুলি তাহাদেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সব বস্তুই ব্রহ্ম এরূপ জ্ঞান অর্জিত হইলে একত্বে পৌঁছান যাইবে, বহুত্বজ্ঞান লোপ পাইবে। তখন পরস্পর কোন ভেদাভেদ আমাদের চোখে পড়িবে না। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থাৎ সকল বস্তুই ব্রহ্ম। এই পরম শুদ্ধ সত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে যিনি অনন্ত সত্তা, যিনি অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার, যিনি অনন্ত আনন্দময় তাঁহাকেই লাভ করিতে পারিব। সেই আনন্দময় ধামে পৌঁছিতে পারিব যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই। যাহাতে এইরূপ জ্ঞানলাভ হয়, সতত তাহার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। ইমারত একদিনে গঠিত হয় না। সকল বস্তুতে ব্রহ্ম দর্শন হইলে কোন দুঃখই আমাদিগকে দিশেহারা করিয়া তুলিতে সুখ দুঃখ যাহা কিছু সবই তাঁহাতে বিলীন হইবে। চতুর্দিক মধুময় হইবে। সুতরাং দুঃখকে জয় করিতে হইলে একমাত্র ব্রহ্মচিন্তাই মুখ্য; সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনই একমাত্র উপায়। নিজেও ব্রহ্মস্বরূপ হইতে হইবে।

দুঃখ নিবৃত্তির ফল :—

রজোগুণই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও নাশের নিদান ; অতএব সেই রজোগুণকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হইলেই দুঃখ নাশ হইয়া যায়। দুঃখ নাশই জীবের একান্ত ঈপ্সিত এবং সেইজন্য দুঃখ হানিই জীবের পরম পুরুষার্থ।

জীব এই পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারিলে জীব আর জীব থাকে না ব্রহ্ম হইয়া যায়।

নদী-সমুদ্রের মিলন, ইহা কেবল মিলন নহে, ইহা মিশ্রণ। এইরূপে মিলিত হইলে নদী, আর নদী থাকে না ; সমুদ্র হইয়া যায়।

উপাখ্যান ১

গৌতমী ও সর্প

পূর্বকালে গৌতমী নামে এক শান্তি পরায়ণা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। অন্ধের যষ্ঠির ন্যায় তাঁহার একটি মাত্র পুত্র ছিল। একদা এক ভুজঙ্গ সেই পুত্রকে দংশন করাতে সে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। ঐ সময় অর্জুনক নামক এক ব্যাধ ক্রোধাবিষ্টচিত্তে সেই সর্পকে, রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া বৃদ্ধার নিকট-আগমন পূর্ব্বক কহিল, ভদ্রে! এই সর্প তোমার পুত্রকে দংশন করিয়াছে, এক্ষণে বল, ইহাকে কি প্রকারে বিনাশ করিব। এই শিশুঘাতী পাপাত্মার প্রাণ রক্ষা কখনই কর্তব্য নহে ; অতএব শীঘ্র বল, ইহাকে হুতাশনে নিক্ষেপ করিব, না খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিব" ?

গৌতমী কহিলেন, "অর্জুনক! তুমি নিতান্ত নির্বোধ, ইহাকে

পরিত্যাগ কর। দেখ, এই ভুজঙ্গকে বধ করিলে আমার পুত্র কদাচ জীবিত হইবে না এবং ইহার জীবন রক্ষা করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব এরূপ স্থলে এই জীবিত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করিয়া কে অনন্তকালের নিমিত্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবে?"

গৌতমী পুনরায় কহিলেন, ব্যাধ! ধর্মাত্মারা সততই বিবেক অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমার এই পুত্র মৃত্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া এই সর্প উহাকে দংশন করিয়াছে; সুতরাং আমি এক্ষণে কোনমতেই এই ভুজঙ্গের প্রাণ সংহার করিতে আদেশ দিতে পারি না; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ক্রোধ করা কর্তব্য নহে; ক্রোধ হইতে পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আমার এই বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রোধ উপস্থিত হয় নাই। তুমি ক্ষমা অবলম্বন পূর্বক এই ভুজঙ্গকে অচিরাৎ পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ কহিল, "সুভগে! এই একমাত্র ভুজঙ্গকে বধ করিলে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হইবে। অতএব ইহাকে রক্ষা করা কোন ক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব অবিলম্বে এই অপরাধীকে বিনাশ করা উচিত"।

গৌতমী বলিলেন, ব্যাধ! এই সর্পের প্রাণসংহার করিলে আমার পুত্র কদাচ পুনর্জীবিত হইবে না; আর ঐ কার্য দ্বারা আমারও পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই, অতএব তুমি অচিরাৎ এই জীবিত সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ সর্পকে বিনাশ করিবার মানসে গৌতমীকে নানা প্রকার যুক্তি তর্ক দেখাইলেও তাঁহার মন কিছু মাত্র বিচলিত হইল না। ঐ সময় সেই বন্ধন নিপীড়িত ভুজঙ্গম কথঞ্চিৎ ধৈর্যাবলম্বন পূর্বক মৃদুস্বরে মনুষ্য ভাষায় ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিল, অরে মূর্খ! এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমি পরাধীন; মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি এই শিশুকে দংশন করিয়াছি। অতএব এই শিশুর মৃত্যুর কারণে যদি কাহাকেও দোষী করা যায় তবে সে মৃত্যু। ব্যাধ বলিল, সর্প! যদিও তুমি অন্যের বশবর্ত্তী হইয়া

এই পাপকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তথাপি তুমিও ইহার এক প্রধান কারণ বলিয়া তোমাকে দোষী হইতে হইবে। অতএব যখন তুমি দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ, তখন তোমাকে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্তব্য।"

সর্প কহিল, 'ব্যাধ! কুম্ভকারের চক্র ও দণ্ড যেমন পরবশ, আমিও তদ্রূপ। চক্র দণ্ডাদি যেমন পরস্পরের পরস্পর যোজনাকারী তদ্রূপ আমি, কাল ও মৃত্যু প্রভৃতি আমরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের যোজক। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রেরক নিবন্ধন সকলের সহিত সকলেরই কার্য কারণ ভাব সংঘটন হইতে পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে আমি একাকী কখনই দোষী ও বধার্হ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। যদি দোষই হইয়া থাকে, তবে আমাদের সকলেরই দোষ হইয়া থাকিবে।

ব্যাধ কহিল, "সর্প! মৃত্যু যদিও এই কার্যের প্রধান কারণ বটে, তথাপি তিনি কখনও ইহার বিনাশকর্তা নহেন। তুমিই ইহার বিনাশের প্রধান হেতু। সুতরাং তোমাকে সংহার করা আমার অবশ্য কর্তব্য। লোক যদি অসৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র সমুদয় বৃথা হইয়া যায় এবং নরপতিরাও তস্করাদির দণ্ড বিধান করিতে পারেন না।"

সর্প কহিল, "ব্যাধ! আমি মৃত্যু কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি সুতরাং আমার যিনি প্রযোজক সেই মৃত্যুই এই শিশুর বিনাশের কারণ। সুতরাং এ বিষয়ে আমাকে দোষী বিবেচনা না করিয়া মৃত্যুকেই দোষী বলিতে পার!"

ব্যাধ বলিল, "অরে, পন্নগাধম! তুই নিতান্ত নির্বোধ, নির্দয় ও শিশুঘাতী। আমি তোকে নিশ্চয় বধ করিব। আর কেন বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছিস্?"

সর্প বলিল, "হে ব্যাধ! যেমন ঋত্বিকগণ যজমান কর্তৃক প্রেরিত হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহারা ফললাভে অধিকারী হয়েন না, আমিও তদ্রূপ মৃত্যু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শিশুর প্রাণ সংহার

করিয়াছি বলিয়া কখনই এই পাপের ফলভাগী হইব না। মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি বালককে বিনাশ করিয়াছি সুতরাং আমি কি নিমিত্ত দোষী হইব ?"

সর্প ও ব্যাধ পরস্পর এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছে, এমন সময় মৃত্যু তথায় উপস্থিত হইয়া সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভুজঙ্গম ! আমি কালকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি বা আমি আমরা কেহই এই শিশুর বিনাশের কারণ নহি। মেঘ সমূহ যেমন বায়ুর বশবর্ত্তী, আমিও তদ্রূপ কালের অধীন। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জন্তু বিদ্যমান রহিয়াছে তাহারা সকলেই কালের বশবর্ত্তী। স্বর্গ বা মর্ত্যভূমিতে যে সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়ই কালের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ সমুদয় জগতই কালের অধীন হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই কালের বশীভূত। কাল বারংবার সূর্য, চন্দ্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র, জল, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদি এ সমুদয় সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। হে ভুজঙ্গম ! তুমি এই সমুদয় অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাকে দোষী বলিয়া স্থির করিতেছ ? এক্ষণে যদি আমাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি যে নির্দোষ, তাহার প্রমাণ কি ?"

সর্প কহিল, "হে মৃত্যো ! আমি আপনাকে দোষী বা নির্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। আমি এইমাত্র কহিতেছি যে, আপনিই আমাকে ঐ শিশু বধার্থে নির্দেশ করিয়াছেন। কালের দোষ থাকুক আর নাই থাকুক আমি তাহা বিচারের কর্তা নহি। এক্ষণে কেবল আমার নিজদোষ প্রক্ষালন করা এবং আপনার প্রতি দোষারোপ না করাই আমার উদ্দেশ্য।" পাশ নিবদ্ধ ভুজঙ্গম মৃত্যুকে এই কথা কহিয়া ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বনচর ! তুমি মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে ; অতএব বিনা অপরাধে আমাকে পাশবদ্ধ করা তোমার অকর্তব্য।"

ব্যাধ কহিল, "সর্প ! আমি তোমার ও মৃত্যুর উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিলাম ; কিন্তু তোমার নির্দোষীতা কোনরূপেই সপ্রমাণ হইতেছে না। মৃত্যু ও তুমি তোমরা উভয়েই এই বালক বধের কারণ হইয়াছ। তোমাদের তুল্য দুঃখকর ও ক্রুর কেহই নাই। তোমাদিগকে ধিক্। আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করিব।"

মৃত্যু কহিলেন, "নিষাদ ! আমাদিগকে কালের বশীভূত হইয়া কার্য করিতে হয় ; অতএব আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার কখনই কর্তব্য নহে"।

ব্যাধ কহিল, "মৃত্যো ! যদি আমি তোমাদিগকে কালের বশবর্তী বলিয়া তোমাদের প্রতি ক্রোধ না করি, তাহা হইলে ত কোন ব্যক্তিরই উপকারীর প্রশংসা ও অপকারীর নিন্দা করা বিধেয় নহে।"

মৃত্যু কহিলেন, "ব্যাধ ! আমি ত পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, প্রাণিগণ যে কোন কর্মের অনুষ্ঠান করে, কালই তাহাদিগকে সেই কার্যের জন্য প্রেরণ করেন। ইহলোকে কালপ্রভাবে সমুদয়কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে ; অতএব উপকারীর স্তুতি বা অপকারকের নিন্দা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নহে। আমরা কাল কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই এইরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। সুতরাং অনর্থক আমাদিগকে অপরাধী করা তোমার উচিত হইতেছে না। দেখ, মেঘ সমুদয় যেমন বায়ুর অধীন, লোক সমুদয় সেইরূপ কালের বশবর্তী। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যাহাদের রাজা এবং অসীম বলশালী গদাপাণি বৃকোদর, যোদ্ধ-শিরোমণি অর্জ্জুন, শরাসন শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব ও শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের সহায়—তাহাদিগকে পদে পদে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল ; কালের কি দুর্বার প্রভাব।"

মৃত্যু ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন, এমন সময় কাল তথায় সমুপস্থিত হইয়া ব্যাধকে কহিলেন—নিষাদ ! কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, আমরা কেহই এই বালকের প্রাণ নাশের বিষয়ে অপরাধী নহি। উহার

পূর্বানুষ্ঠিত কর্মই আমাদিগকে উহার বিনাশ-সাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ফলতঃ এই বালক নিজ কর্ম বশতঃ অকালে কাল কবলে নিপতিত হইয়াছে। অতএব কর্ম্মকেই ইহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। মনুষ্য যেমন কর্মের বশীভূত, কর্ম সমুদয়ও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ব। কুম্ভকার যেমন মৃৎ পিণ্ডদ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘট, শরা ইত্যাদি নির্মাণ করে তদ্রূপ মনুষ্য স্বেচ্ছানুসারে সমুদয় কর্ম করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম ও কর্তা নিরন্তর পরস্পর সুসম্বন্ধে যুক্ত রহিয়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী, আমাদের মধ্যে কাহাকেও এই বালকের মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। এই শিশু স্বয়ংই নিজের বিনাশের কারণ জানিবে।

কাল এই কথা কহিলে, বৃদ্ধা গৌতমী লোক সমুদয়কে কর্মের বশবর্ত্তী অবগত হইয়া ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"অর্জুনক! কাল, সর্প, বা মৃত্যু আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান স্বীয় কর্ম-দোষেই নিহত হইয়াছে। আমিও আমার কর্মবশতঃ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে, কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন এবং তুমিও ঐ সর্পকে পরিত্যাগ কর।"

মহানুভবা ব্রাহ্মণী এই কথা কহিলে, কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করিলেন! অর্জুনক ব্যাধ দোষবিহীন সর্পকে পরিত্যাগ করিল এবং গৌতমীও পুত্রশোক পরিত্যাগ পূর্বক শান্তিলাভ করিলেন। উপদেশ— পৃথিবীতে নিজ নিজ কর্মবশতঃই কাল প্রভাবে জীবকে দেহত্যাগ করিতে হয়; এবং শুভাশুভ কর্ম অনুযায়ী পরজন্মে ফলভোগ হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে—"শাপের লেখা আর বাঘের দেখা।"

উপাখ্যান ২

ছত্র ও পাদুকার উৎপত্তি

পূর্বকালে একদা মহর্ষি জমদগ্নি ক্রীড়ার্থ শরাসনে শর সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার পত্নী রেণুকা সেই নিক্ষিপ্ত শর সমুদয় আহরণ করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই শর ও জ্যা শব্দে জমদগ্নির কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তিনি বাণ নিক্ষেপে নিতান্ত আসক্ত হইয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার পত্নী রেণুকাও বারংবার তৎসমুদয় আহরণ পূর্বক তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন সময় সমুপস্থিত হইল, জমদগ্নি তথাপি শর নিক্ষেপে নিরস্ত হইলেন না। তিনি পূর্বের ন্যায় শর পরিত্যাগ করিয়া রেণুকাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি শীঘ্র শর সমুদয় আনয়ন কর, আমি পুনরায় উহা পরিত্যাগ করিব। জমদগ্নি এই আজ্ঞা করিবামাত্র রেণুকা শর আনয়নার্থ ধাবমান হইলেন। একে জ্যৈষ্ঠমাস, তাহাতে আবার মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। পতিব্রতা রেণুকা সেই ভীষণ সময়ে স্বামীর নির্দেশানুসারে গমন করাতে আতপ তাপে তাঁহার মস্তক ও পদতল নিতান্ত সন্তাপিত হইল। তখন তিনি অগত্যা অতি অল্পকাল বৃক্ষচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া পরিশ্রম অপনোদন করিলেন এবং পরিশেষে শরসমুদয় গ্রহণ পূর্বক ভর্তার শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অতিসত্বর ঘর্মাক্ত দেহে কম্পিত কলেবরে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন জমদগ্নি তাঁহাকে অবলোকন পূর্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন,—"তোমার এত বিলম্ব হইল কেন?"

রেণুকা স্বামীকে নিতান্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "ভগবন্! আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। সূর্যকিরণে আমার মস্তক ও

পদতল নিতান্ত সন্তপ্ত হওয়াতে আমি বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াছিলাম তাহাতেই আমার বিলম্ব হইয়াছে।”

রেণুকা এইরূপে আপনার দুঃখ প্রকাশ করিলে মহাপ্রভাব জমদগ্নি সূর্যের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ‘প্রিয়ে! আজ আমি মহাতেজ প্রভাবে তোমার দুঃখদাতা প্রদীপ্তকিরণ দিবাকরকে নিপাতিত করিব।”

মহর্ষি এই বলিয়া শরাসন বিস্ফারণ পূর্বক শর গ্রহণ করিয়া সূর্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সূর্যদেব তাঁহাকে যুদ্ধবেশ ধারণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বেশে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, “ভগবন! দিবাকর আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছেন? তিনি লোক-সমুদয়ের হিত সাধনের নিমিত্তই স্বর্গে অবস্থান পূর্বক স্বীয় কিরণ জাল দ্বারা ক্রমশঃ রস আকর্ষণ করিয়া বর্ষাকালে মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে সেই রস বর্ষণ করেন। তাহাতেই ওষধি ও লতা সকল পত্র পুষ্প যুক্ত এবং জীবগণের প্রাণ স্বরূপ অন্ন সমুৎপন্ন হয়। জাতকর্ম, ব্রত, উপনয়ন, বিবাহ, যজ্ঞ, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্যসমুদয় অন্নদ্বারায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমি আপনার নিকট যাহা কীর্তন করিলাম, আপনি তৎসমুদয় অবগত আছেন। অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে বিনয় করিয়া কহিতেছি, আপনি সূর্যকে নিপাতিত করিবেন না।”

দিবাকর এইরূপ প্রার্থনা করিলেও হুতাশনসমপ্রভ জমদগ্নি কিছুতেই ক্রোধ সম্বরণ করিলেন না। তখন সূর্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে মধুর বাক্যে পুনরায় কহিলেন, “ভগবন্! সূর্য অন্তরীক্ষে সততই পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি কিরূপে সেই সদা চঞ্চল সূর্যকে বিদ্ধ করিবেন?”

জমদগ্নি কহিলেন, ‘ব্রহ্মন্! আমি জ্ঞানচক্ষু প্রভাবে তোমাকে সূর্য বলিয়া অবগত হইয়াছি, এবং তুমি কোন্ সময়ে পরিভ্রমণ ও কোন্

সময়েই বা স্থির ভাবে অবস্থান কর, তাহাও সবিশেষ জ্ঞাত আছি। তুমি মধ্যাহ্নকালে নিমেষার্দ্ধ নভোমণ্ডলে বিশ্রাম করিয়া থাক। আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে সেইক্ষণে তোমাকে বিদ্ধ করিব। তখন দিবাকর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি আমাকে শর দ্বারা নিশ্চয়ই বিদ্ধ করিবেন বলিয়া যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমি আপনার অপকার করিয়াছি বটে, কিন্তু আপনাকে আমায় রক্ষা করিতে হইবে।"

তখন মহর্ষি জমদগ্নি হাস্যমুখে সূর্যকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, "দিবাকর! তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইলে তখন তোমার আর কিছু-মাত্র শঙ্কা নাই। শরণাগত ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে গুরুপত্নী গমন, ব্রহ্ম-হত্যা, গো-হত্যা ইত্যাদি পাপে দূষিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে তোমার উত্তাপ প্রভাবে পথিমধ্যে আমার পত্নীর গমনাগমনের কোন কষ্ট না হয়, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর।" এই বলিয়া মহর্ষি জমদগ্নি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন দিবাকর ছত্র ও পাদুকাযুগল প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, "ভগবন্! আমার কঠোর কিরণ হইতে মস্তক ও চরণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই ছত্র ও পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করুন। অদ্যাবধি অক্ষয় ফলপ্রদ ছত্র ও পাদুকাযুগল পবিত্র দান কার্যে প্রচলিত হইবে।" তদবধি-শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ছত্র ও পাদুকা দান কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

উপদেশ—কঠোর তপঃ প্রভাবান্বিত ব্যক্তির নিকট মহাশক্তিশালী ব্যক্তিও বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তপস্যার এমনি দুর্বার শক্তি; এই শক্তি-বলে বলীয়ান হইলে ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

উপাখ্যান ৩

ভরতের মৃগত্ব প্রাপ্তি

কোন এক সময়ে রাজর্ষি ভরত গণ্ডকী নদীতে স্নান এবং নিত্য-নৈমিত্তিক ও আবশ্যক কর্ম সকল যথাকালে সম্পাদন করিয়া নদীতীরে বসিয়া প্রণব জপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটি হরিণী জলপান করিবার জন্য একাকিনী সেই নদীর নিকট আগমন করিল। সে যখন তৃষ্ণাতুর হইয়া জলপান করিতেছিল, অদূরে তখন একটা সিংহ গর্জন করিল। তাহাতে ভয়ঙ্কর এক মহাশব্দ উদ্ভূত হইল। একে হরিণী-হৃদয় স্বভাবতঃ ভীত, তাহাতে আবার মহাভয় উপস্থিত হইল; সুতরাং তাহার হৃদয় সাতিশয় ব্যাকুল হইল। সে পরিভ্রান্ত নয়নে সচকিত ভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভয়ে তৎক্ষণাৎ নদীতে লাফাইয়া পড়িল। ঐ হরিণী গর্ভবতী ছিল। যখন সে নদীর পরপারে যাইবার উপক্রম করিল, তখন গুরুতর ভয়ে সেই গর্ভ স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া গর্ভযোনি হইতে নিঃসারিত হইয়া নদী-স্রোতে পতিত হইল। হরিণী একে মহাভীতা, তাহাতে গর্ভপাত হইল; তাহার উপর আবার নদী-উল্লঙ্ঘন করিবার উদ্যমে নিরতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়াতে তাহার মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত হইল। সে তখন স্বজন বিরহিতা হইয়া একটা পর্বতের গুহায় পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণত্যাগ ঘটিল। এখানে রাজর্ষি ভরত নদীতীরে বসিয়া সমস্ত ঘটনা দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন—হরিণীর মৃত্যু হইল, তাহার সঙ্গিগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল এবং মৃগশাবকটি নদীর স্রোতে ভাসিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে দয়া উদিত হইল। তিনি সেই মাতৃহারা হরিণ শিশুকে জল হইতে উঠাইয়া আপনার আশ্রমে লইয়া গেলেন। সেই হরিণ শাবককে ক্রমে তাঁহার "এ আমার" এইরূপ অভিমান জন্মিল। তিনি

অহরহঃ তৃণাদি দিয়া তাহার পোষণ করিতে লাগিলেন। বৃকাদি (নেকৃড়ে বাঘ ইত্যাদি) হইতে রক্ষা করিয়া কণ্ডুয়নাদি দ্বারা সুখ সম্পাদন করিয়া এবং চুম্বনাদি করিয়া তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের যম, নিয়ম এবং ভগবৎ পরিচর্যা প্রভৃতি এক একটি করিয়া অপনীত হইল। কতিপয় দিবস মধ্যে সমুদয় লোপ পাইল। তিনি অহরহঃ কেবল চিন্তা করিতেন—আহা, এই হরিণ শিশুটি অতি দীন ; এ কালবশে স্বজন-বন্ধু বান্ধব ভ্রষ্ট হইয়া আমারই শরণ লইয়াছে ; এ আমাকেই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও যূথপতি বলিয়া জানে—আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না। আমাতেই অতিশয় বিশ্বস্ত। "ইহার জন্য আমার স্বার্থহানি হইতেছে"—এরূপ না ভাবিয়া আমার কর্তব্য হইতেছে এই হরিণ শিশুকে সর্বপ্রকারে লালন পালন করা। শরণাগত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিলে যে কি দোষ, তাহা আমার জানা আছে। ইহাকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। সাধুগণই দীনজনের বন্ধু।

ভরতের চিন্তা সেই একমাত্র হরিণেই আসক্ত হওয়াতে তিনি সেই হরিণ শাবকের সহিত উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান ও ভোজনাদি করিতে লাগিলেন। কুশ, পুষ্প, যজ্ঞকাষ্ঠ, পত্র, ফল, ফুল ও জল আহরণ করিবার নিমিত্ত যখন তিনি বনে গমন করিতেন, তখন পাছে বৃক, কুক্কুরাদি আসিয়া তাহাকে ভক্ষণ করে, এই ভয়ে ঐ মৃগ শাবককে সঙ্গে লইয়া তিনি বনে প্রবেশ করিতেন। তিনি পথে পথে মুগ্ধচিত্তে, অনুরক্ত মনে, স্নেহভরে এক একবার তাহাকে স্কন্ধে লইয়া বহন করিতেন। কখন কোলে, কখন বক্ষস্থলে রাখিয়া লালন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি জপ, তপ, ও কর্তব্যনিষ্ঠা শেষ করিতে না করিতে, মধ্যে মধ্যে এক একবার ঐ হরিণ শিশুকে দেখিতেন। কৃপণ ব্যক্তি ধন হারাইলে যেরূপ ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ভরত যখন তাহাকে না দেখিতেন তখন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেন এবং অত্যন্ত ঔৎসুক্যে তাঁহার হৃদয় সাতিশয় বিকল ও

সন্তপ্ত হইত। দিবাকর সম্প্রতি অস্ত যাইতেছেন। কৈ, এখনও ত সেই মাতৃহীন হরিণ শিশুটি আসিল না? রাজর্ষি ভরত এইরূপ বিলাপ করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া বহির্গত হইলেন। ভূমিতে মৃগশাবকের খুর-চিহ্ন দেখিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, আহা! এই ভূমি অতিশয় ভাগ্যবতী; এ কি তপস্যা করিয়াছিল যে, সেই বিনয় নম্র হরিণ শিশুর পদ পংক্তির দ্বারা স্থানে স্থানে অঙ্কিত হইয়া আমাকে পথ প্রদর্শন করিতেছে এবং আপনাকেও এতদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া দ্বিজগণের যজ্ঞস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে; আমি সেই মৃগশিশুর বিরহে অতিশয় দুঃখিত হইতেছিলাম। এক্ষণে এই খুর-খাত দেখিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম। তারপর ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিপাতে যখন উদয়শীল চন্দ্রমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইল, তখন তাহাতে মৃগ-চিহ্ন দেখিয়া তাহাকেই আপনার মৃগশাবক বোধ করিয়া কহিলেন, "অহো! আমার এই মাতৃহীন মৃগশাবক আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্র পড়িয়া থাকিবে;—এই ভাবিয়া বুঝি দীনবৎসল তারাপতি করুণা বশতঃ সিংহভয়ে আপনার নিকটে রাখিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছেন।" তারপর চন্দ্রকিরণে সুখ স্পর্শ হওয়াতে তিনি মৃগশাবক অদর্শন হেতু হৃদয়ে অনেকটা বিরহ মুক্ত হইলেন। আবার চিন্তা মগ্ন হইলেন—আহা! আমার স্নেহের, আমার শরণাগত সেই মৃগশিশুটি আমার অবর্তমানে কোথায় কিভাবে প্রাণধারণ করিবে? এই সকল ভাবনা চিন্তা, ভরতের হৃদয়কে অহর্নিশ উত্তপ্ত করিতে লাগিল। যে ভরত মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া নিজ সন্তান সন্ততিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং ভগবৎ আরাধনা ব্যতীত ক্ষণমাত্রও বৃথা ক্ষেপণ করিতেন না, অবশেষে তিনি মৃগ-শিশুর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া সেই পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে দুরতিক্রম মৃত্যুকাল তাঁহাকে গ্রাস করিল। তিনি মৃগেই চিত্ত অর্পণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন এবং পরজন্মে মৃগ-শরীর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পূর্বজন্মের স্মৃতি, দেহের সহিত বিনষ্ট হইল না। আপনার মৃগদেহ ধারণের কারণ

স্মরণ করিয়া মনস্তাপ করিতে লাগিলেন। তিনি যে কালঞ্জর পর্ব্বতে জন্মিয়াছিলেন, তথায় আপনার মৃগী-মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া হরিক্ষেত্রে পুলস্ত্য-পুলকাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

উপদেশ—মৃত্যুসময়ে যে ব্যক্তি যেরূপ চিন্তা করে, মৃত্যুর পর সে সেই ভাবে মিলিয়া যায়; কিন্তু পূর্ব পূর্ব কোন জন্মে সে যদি মনুষ্যদেহ ধারণ ও উৎকর্ষতা লাভ করিয়া থাকে তবে তাহার ভিতর মানবীয় আত্মার ধর্ম নিহিত থাকে; কালক্রমে সে আবার মনুষ্যদেহ ধারণ ও উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে।

উপাখ্যান ৪

সন্ন্যাসী ও গৃহী

যদি কেহ সংসার হইতে দূরে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যান, তাঁহার এরূপ ভাবা উচিত নয় যে, যাঁহারা সংসারে থাকিয়া জগতের হিত-চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না; আবার যাঁহারা নিজেদের স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য সংসারে রহিয়াছেন, তাঁহারা যেন সংসার-ত্যাগীদিগকে নীচ ভবঘুরে মনে না করেন। নিজ নিজ কর্ম ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মহান্। নিম্নলিখিত উপাখ্যান পাঠে বিষয়টি বেশ ভালভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে সমাগত সকল সাধু সন্ন্যাসীকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "যে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে সে বড়, না, যে গৃহে থাকিয়া গৃহস্থের সমুদয় কর্তব্য করিয়া যায় সে-ই বড়?" অনেক বিজ্ঞ লোক এই সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, 'সন্ন্যাসী বড়'। রাজা এই বাক্যের

প্রমাণ চাহিলেন। যখন তাঁহারা প্রমাণ দিতে অক্ষম হইলেন, তখন রাজা তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইবার আদেশ দিলেন। আবার অনেকে আসিয়া বলিলেন, 'স্বধর্ম্ম পরায়ণ গৃহস্থই বড়। রাজা তাঁহাদের নিকটও প্রমাণ চাহিলেন। যখন তাঁহারা প্রমাণ দিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাদিগকেও তিনি গৃহস্থ করিয়া নিজ রাজ্যে বাস করাইলেন।

অবশেষে আসিলেন এক যুবা সন্ন্যাসী; রাজা তাঁহাকেও ঐরূপ প্রশ্ন করাতে সন্ন্যাসী বলিলেন, "হে রাজন্! নিজ নিজ, কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়।" রাজা বলিলেন, 'একথা প্রমাণ করুন'। সন্ন্যাসী বলিলেন, "হাঁ, আমি প্রমাণ করিব। তবে কিছুদিন আপনাকে আমার মতো থাকিতে হইবে, তবেই যাহা বলিয়াছি তাহা আপনার নিকট প্রমাণ করিতে পারিব।" রাজা সম্মত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর অনুগামী হইয়া রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করিয়া আর এক বড় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই রাজ্যের রাজধানীতে তখন এক মহাসমারোহ ব্যাপার চলিতেছিল। রাজা ও সন্ন্যাসী ঢাক ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি এবং ঘোষণাকারীদিগের চীৎকার শুনিতে পাইলেন। পথে লোকেরা সুসজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—আর ঢেঢরা পেটা হইতেছে। রাজা ও সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাপারটা কি। ঘোষণাকারী চিৎকার করিয়া বলিতেছিল, "এই দেশের রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন।

যথা সময়ে স্বয়ম্বর সভার আয়োজন হইল। নিকটবর্ত্তী সকল রাজ্যের রাজপুত্রগণ শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া সভায় সমাসীন। ঘোষিত হইয়াছিল যে, রাজার মৃত্যুর পর রাজকন্যাই রাজ্যলাভ করিবেন। রাজা ও সন্ন্যাসী সভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সিংহাসনে সমাসীনা রাজকন্যা সভায় প্রবেশ করিলেন এবং বাহকগণ তাঁহাকে সভামধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লইয়া যাইতে লাগিলেন। রাজকন্যা কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। উপস্থিত রাজপুত্রগণ ব্যর্থ ভাবিয়া

নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন। রাজকন্যার ইচ্ছা ছিল, সর্বাপেক্ষা সুপুরুষকে বিবাহ করেন; কিন্তু তাঁহার মনের মতো সুপুরুষ তাঁহার দৃষ্টি গোচর হয় নাই। এমন সময় এক যুবা সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার রূপের প্রভা দেখিয়া বোধ হইল যেন স্বয়ং সূর্যদেব আকাশ মার্গ ছাড়িয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সভার এক কোণে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন—কি হইতেছে। রাজকন্যা সহ সেই সিংহাসন তাঁহার নিকটবর্তী হইল। রাজকন্যা সেই পরম রূপবান সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র বাহকদিগকে থামিতে বলিয়া সন্ন্যাসীর গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। যুবা সন্ন্যাসী মালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "এ কি নির্বুদ্ধিতা! আমি সন্ন্যাসী; আমার পক্ষে বিবাহের অর্থ কি?" রাজকুমারীর পিতা সেই দেশের রাজা মনে করিলেন, লোকটি বোধ হয় দরিদ্র, সেই জন্য রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে সাহস করিতেছে না; অতএব তিনি বলিলেন—"আমার কন্যার সহিত তুমি এখনই অর্দ্ধেক রাজত্ব পাইবে এবং আমার মৃত্যুর পর সমগ্র রাজ্য।" এই বলিয়া সন্ন্যাসীর গলায় আবার মালা পরাইয়া দিলেন।

"কি বাজে কথা! আমি বিবাহ করিতে চাই না, তবু এ কি?" বলিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় মালা ফেলিয়া দিয়া দ্রুত পদে সেই সভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে এই যুবা সন্ন্যাসীটির প্রতি রাজকন্যা এতদূর অনুরক্ত হইয়া ছিলেন যে, তিনি বলিলেন—"হয় আমি ইহাকে বিবাহ করিব নতুবা মরিব।" রাজকন্যা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার অনুবর্তন করিলেন। তারপর আমাদের সেই অপর সন্ন্যাসী—যিনি রাজাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে আনিয়াছিলেন—বলিলেন, চলুন রাজা, আমরা এই দুইজনের অনুগমন করি।" এই বলিয়া তাঁহারা অনেকটা দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন। যে-সন্ন্যাসী, রাজকুমারীর পাণি-গ্রহণে

অসম্মত হইয়াছিলেন, তিনি রাজধানী হইতে বাহির হইয়া কয়েক ক্রোশ গ্রামের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এক বনে প্রবেশ করিলেন, রাজকন্যা তাঁহার অনুগমন করিলেন; অপর দুইজনও তাঁহাদের পিছনে পিছনে চলিলেন।

এই যুবা সন্ন্যাসী ঐ বনটিকে ভালভাবেই জানিতেন; উহার কোথায় কি আঁকাবাঁকা পথ আছে, সব জানিতেন। সন্ধ্যা-সমাগমে হঠাৎ তিনি এইরূপ একটি জটিল পথে প্রবেশ করিয়া একেবারে অন্তর্হিত হইলেন। রাজকন্যা তাঁহার আর কোন সন্ধান পাইলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া তিনি একটি বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কারণ তিনি সেই বন হইতে বাহিরে আসিবার পথ জানিতেন না। তখন সেই রাজা ও সঙ্গী সন্ন্যাসীটি তাঁহার নিকট আসিলেন এবং সন্ন্যাসী বলিলেন—"কাঁদিও না, মা, আমরা তোমাকে এই বনের বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিব। কিন্তু এখন অন্ধকার যেরূপ গাঢ়, তাহাতে পথ বাহির করা বড় কঠিন, এই একটা বড় গাছ রহিয়াছে, এস, আজ আমরা ইহার তলায় রাত্রিটা যাপন করি; প্রভাতে তোমাকে বাহির হইবার পথ দেখাইয়া দিব।"

সেই গাছে এক পাখির বাসা ছিল। তাহাতে একটি ছোট পাখি, পক্ষিণী ও তাহাদের তিনটি ছোট ছোট শাবক থাকিত। ছোট পাখিটি নীচের দিকে চাহিয়া গাছের তলায় তিনজন লোককে দেখিল এবং পক্ষিণীকে বলিল,—"দেখ, কি করা যায়? আমাদের ঘরে কয়েকজন অতিথি আসিয়াছেন—শীতকাল, আর আমাদের নিকট আগুনও নাই।" এই বলিয়া সে উড়িয়া গেল, ঠোঁটে করিয়া একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া আসিল এবং উহা তাহার অতিথিদিগের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাঁহারা সেই অগ্নিখণ্ডে কাঠকুঠা দিয়া বেশ আগুন প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু পাখিটির তাহাতে তৃপ্তি হইল না। সে তাহার পক্ষিণীকে বলিল, "প্রিয়ে, আমরা

কি করি? ইহাদিগকে খাইতে দিবার মতো কিছুই তো আমাদের ঘরে নাই; কিন্তু ইহারা ক্ষুধার্ত, আর আমরা গৃহস্থ, ঘরে যে-কেহ আসিবে, তাহাকেই খাইতে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আমি নিজে যতদূর পারি করিব। ইহাদিগকে আমি আমার শরীরটাই দিব। এই বলিয়া সে উড়িয়া গিয়া বেগে সেই অগ্নির মধ্যে পড়িল ও মরিল। অতিথিরা তাহাকে পড়িতে দেখিলেন, এবং তাহাকে বাঁচাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে এত দ্রুত আসিয়া আগুনে পড়িল যে, তাঁহারা বাঁচাইতে পারিলেন না।

পক্ষিণী তাহার স্বামীর কার্য দেখিয়া মনে মনে বলিল—ইহারা তিনজন রহিয়াছেন, ইহাদের খাইবার জন্য মাত্র একটি ছোটপাখি! ইহা যথেষ্ট নয়। স্ত্রীর কর্তব্য—স্বামীর কোন উদ্যম বিফল হইতে না দেওয়া। অতএব আমার শরীরও ইহাদের জন্য উৎসর্গ করি। এই বলিয়া সেও আগুনে ঝাঁপ দিল এবং পুড়িয়া মরিয়া গেল।

শাবক তিনটি সবই দেখিল—কিন্তু ইহাতেও তিন জনের পর্যাপ্ত খাদ্য হয় নাই দেখিয়া বলিল,—"আমাদের পিতামাতা যতদূর সাধ্য করিলেন কিন্তু তাহাও তো যথেষ্ট হইল না। পিতামাতার কার্য সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা সন্তানের কর্তব্য; অতএব আমাদের শরীরও এই উদ্দেশ্যে সমর্পিত হউক—এই বলিয়া তাহারাও সকলে মিলিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিল।

ঐ তিন ব্যক্তি যাহা দেখিলেন তাহাতে আশ্চর্য হইয়া গেলেন, কিন্তু পাখিগুলিকে খাইতে পারিলেন না। কোনরূপে তাঁহারা অনাহারে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রভাত হইলে রাজা ও সন্ন্যাসী সেই রাজকন্যাকে পথ দেখাইয়া দিলেন, এবং তিনি তাঁহার পিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন, দেখিলেন তো নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়। যদি সংসারে থাকিতে চান তবে ঐ পাখিদের মতো প্রতি মুহূর্তে পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকুন। আর যদি সংসার ত্যাগ করিতে চান, তবে ঐ

যুবা সন্ন্যাসীটির মতো হউন, যাহার পক্ষে পরমাসুন্দরী যুবতী ও রাজ্য অতি তুচ্ছ মনে হইয়াছিল। যদি গৃহস্থ হইতে চান, তবে আপনার জীবন সর্বদা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকুন। আর যদি আপনি ত্যাগের জীবনই বাছিয়া লন, তবে সৌন্দর্য ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করিবেন না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বড়, কিন্তু একজনের যাহা কর্তব্য, তাহা অপরজনের কর্তব্য নহে। শাস্ত্র কোনটিকেই হীন বা উন্নত বলিতেছে না। বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রে বিভিন্ন কর্তব্য রহিয়াছে এবং আমরা যে অবস্থায় রহিয়াছি, আমাদিগকে তদুপ-যোগী কর্তব্য পালন করিতে হইবে, প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া অপেক্ষা প্রকৃত গৃহস্থ হওয়া কঠিন।

(-- স্বামী বিবেকানন্দ)

উপাখ্যান ৫

কর্ণ ও শ্রী

একদা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, কর্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে. অর্জ্জুনের অস্ত্র ছেদন পূর্ব্বক অসাধারণ পরাক্রম দর্শাইয়া প্রবল হইয়া উঠিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কর্ণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া কহিলেন—"হে অর্জ্জুন! অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণের সমীপবর্ত্তী হও"। অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর ভয়ঙ্কর দিব্য রৌদ্রাস্ত্র মন্ত্রপুত করিয়া ক্ষেপণ করিতে বাসনা করিলেন। ঐ সময় বসুমতী কর্ণের রথচক্র দৃঢ়ভাবে গ্রাস করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভুজদ্বয় দ্বারা চক্রের উদ্ধার-চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন সপ্তদ্বীপা মেদিনী বাহুবলে আকৃষ্ট হইয়া চারি অঙ্গুলী পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন কিন্তু কর্ণের রথচক্র কোন ক্রমেই উদ্ধৃত হইল না। তখন তিনি (কর্ণ) ক্রোধে অশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোপাবিষ্ট

অর্জ্জুনকে কহিলেন—হে পার্থ! তুমি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। আমি মহীতল হইতে রথচক্র উদ্ধার করিতেছি। দৈব বশতঃ আমার রথচক্র পৃথিবীতে প্রোথিত হইয়াছে। এ সময়ে তুমি কাপুরুষোচিত দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। তুমি রণপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত আছ। এক্ষণে অভদ্রের ন্যায় তোমার কার্য করা কর্ত্তব্য নহে। হে অর্জ্জুন! উত্তম সময় নিয়ম পালন কারী শূরগণ শরণাগত প্রার্থী, অস্ত্রত্যাগী, বাণ বিহীন, ভগ্ন বর্ম ব্যক্তির এবং ব্রাহ্মণের প্রতি শর নিক্ষেপ করেন না। ইহলোকে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর, ধার্ম্মিক, যুদ্ধ ধর্ম্মাভিজ্ঞ, জ্ঞানবান, উত্তম অস্ত্রবিৎ, মহাত্মা, বেদ পরায়ণ, অসীম পরাক্রান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। বিশেষতঃ আমি এক্ষণে বলহীন। আমি যে পর্য্যন্ত রথচক্র উদ্ধার করিতে না পারি তাবৎ আমাকে বিনাশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি ক্ষত্রিয়দিগের মহাকুলে সমুৎপন্ন হইয়াছ বলিয়াই তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি মুহূর্ত্তকাল আমাকে রক্ষা কর।"

ঐ সময় বাসুদেব কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন—'হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম্মস্মরণ করিতেছ। নীচাশযেরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাদের দুষ্কর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে যখন সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধি করতঃ তোমার অনুমোদনে পাশা খেলায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতু গৃহ মধ্যে নিদ্রিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভা মধ্যে দুঃশাসন

কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক ধৃতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে "হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিকে বরণ কর" এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্য লোভে শকুনিকে আশ্রয় পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূত ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথিগণ-সমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুকে-পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল?

হে কর্ণ! তুমি যখন সেই সেই সময়ে অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে? তুমি এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও জীবনসত্ত্বে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্ব্বে নিষদ দেশাধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও ভুজবলে সসৈন্য শত্রুগণকে বিনাশ পূর্ব্বক রাজ্য লাভ করিবেন "ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ অবশ্যই ধর্ম্ম সংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে"।

উপদেশ—ধর্ম্মবলে বলীয়ান পক্ষকে শত্রু পক্ষ কখনও বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী।

উপসংহার

সকলে সুখ চায় কিন্তু সুখের পূর্ণত্বলাভ হয় না মায়াবদ্ধ জীবের মলিন বাসনার জন্য। মলিন বাসনা সকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইলেই আত্যন্তিক দুঃখ জন্মে, মৃত্যুও ব্যাধির কলেবর বৃদ্ধি করিয়া জীবের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সকল মলিন বাসনা দূরীভূত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সংস্কারজাত কর্ম্মের অনুবর্ত্তী থাকিয়া পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হইবে। স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার-কর্ম্মের আকর্ষণ পিতাপুত্র বন্ধু মাতা ও কলত্রে অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এই ভাবগুলি জীবের সহজসাধ্য ভাব, অর্থাৎ পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধু বান্ধব লইয়া সংসার পাতাই বদ্ধজীবের স্বভাব। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর এই পাঁচপ্রকার ভাব বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রধান স্থান দখল করিয়া আছে। এ ভাব কয়েকটি বদ্ধজীবের সংসারে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পুত্রের জ্ঞানার্জ্জনে পিতার শান্তপ্রেম,
পিতৃ সেবার দ্বারা পুত্রের দাস্যপ্রেম,
মিত্রদিগের উপকার দ্বারা বন্ধুর সখ্যপ্রেম,
পুত্র পালনে মাতার বাৎসল্য প্রেম এবং
পতিপত্নীর দাম্পত্য সুখে মধুর প্রেম।

এই স্বকীয় প্রেমগুলি সংস্কার অনুবর্ত্তী হইয়াই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত বস্তুতে মিলন ঘটাইয়া থাকে ; অতএব এইগুলি জীবের সহজ ভক্তি। এই সহজ ভক্তি ভাবগুলির উপর যদ্যপি স্বার্থ শূন্য হইতে পারা যায় অর্থাৎ এই ব্যক্তিগত ভাব যদি সমষ্টিগত জীবের উপর আরোপ করা যায়, তাহা হইলে স্বকীয় প্রেমগুলিই অনাসক্তি বশতঃ সহজে অহৈতুকী প্রেমে পরিণত হইতে পারিবে, সসীম হইতে অসীম হইলে অহৈতুকী প্রেম হইয়া থাকে। তখন জীবের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না, ঈশ্বরজ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটে এবং ইহাই জীবের লক্ষ্য।

আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী, পরমাত্মাও তদ্রূপ সর্বব্যাপী বিভু। সর্ব্যব্যাপী আকাশকে যেমন মহাকাশ বলে, পরমাত্মাকেও তদ্রূপ চৈতন্যস্বরূপ বলা হইয়া থাকে। আকাশ যখন ঘটে থাকে, তখন তাহাকে ঘটাকাশ বলে। তদ্রূপ পরমাত্মাও যখন দেহ ঘটে থাকেন তখন তাঁহাকে জীবাত্মা বলা হয়। ঘটভগ্ন হইলে যেমন ঘটাকাশ ধ্বংস হয় না, যেখানকার আকাশ সেইখানেই থাকে, তদ্রূপ দেহ ঘট ধ্বংস হইলেও, দেহ ঘটস্থিত চৈতন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হন না, যেখানকার চৈতন্য সেইখানেই থাকেন। অতএব জীব চৈতন্য, ব্রহ্ম চৈতন্য একই; উপাধি বশতঃ কেবল পৃথক পৃথক নাম ধারণ করেন মাত্র।

যেমন গঙ্গার জল, খালের জল, ঘটির জল, সব জলই জল। সকলকেই জল বলা হয় এবং জল একই; অবস্থা বিশেষে, আধার অনুযায়ী পৃথক পৃথক নাম প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ জীবাত্মাও পরমাত্মা একই; অবস্থা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হন। সর্বব্যাপী সমষ্টিভূত চৈতন্যই পরমাত্মা এবং ব্যষ্টিভূত চৈতন্য জীবাত্মা।

"পাশবদ্ধঃ ভবেদ্‌জীব, পাশমুক্ত সদাশিবঃ" (শিব সংহিতা)। ভৌতিক দেহ ধ্বংস হইলে আত্মা সূক্ষ্ম দেহে অবস্থান করেন, সূক্ষ্ম দেহ ধ্বংস হইলে আত্মা কারণ দেহে অবস্থান করেন। যতদিন পর্যন্ত আত্মার কারণ দেহ ধ্বংস না হয়, ততদিন পর্যন্ত আত্মার বন্ধন মোচন হয় না। অতএব এই ত্রিবিধ উপাধি হইতে আত্মার উদ্ধার করিতে পারিলেই আত্মার বন্ধন মোচন হইয়া থাকে, তখন তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের প্রকৃত সত্ত্বা নাই কেননা উহারা পরিবর্তনশীল। কেবল অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সৎবস্তু, অন্য সমস্তই অসৎ বা মায়া কল্পিত; যেরূপ অন্ধকার রাত্রিতে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, অথবা শুক্তিতে রজত ভ্রম হইয়া থাকে; তদ্রূপ এই দৃশ্যমান জগতও সত্য বলিয়া অনুভূত হয়। আত্মজ্ঞান দ্বারা মায়াভ্রম উপাধি দূরীভূত করিতে পারিলে

আত্ম-জ্ঞান লাভ হইবে। অজ্ঞানতা অপসারিত হইলে সর্বভূতে আত্মদর্শন হইবে।

পরের দুঃখ মনোযোগের সহিত দেখাশুনাই হইতেছে দয়াবৃত্তি প্রকটের উপায়। দয়াই প্রধান ধর্ম; যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণে দয়াবৃত্তি না জাগে, ততক্ষণ তাহার দ্বারা শ্রদ্ধায় কার্য হইতে পারে না। যখন দয়া হইতে অনুষ্ঠিত কর্তব্যকর্ম সম্পাদিত হয়, তখন সেই কর্ম নিষ্কাম অর্থাৎ ফলশূন্য হয়। ফলশূন্য হইলে প্রেম জন্মে; প্রেমদ্বারা ভগবান প্রাপ্তি ঘটে। তুমি যে সব কর্ম করিতেছ, ঐ সব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ভাবে করিতে পার, তবে খুব ভালো। এই নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতে ঈশ্বরে ভক্তি ভালবাসা আসিবে।

পুরাণে আছে—চুরাশী লক্ষ বার নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিবার পর জীব মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়। প্রথমে কুৎসিত জন্ম অর্থাৎ গারো, কোল, চণ্ডাল প্রভৃতি মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া একশত বার শূদ্র যোনিতে পরিভ্রমণ করে। তৎপর দ্বিজসংজ্ঞা অন্তর্গত বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এই দুইটি উত্তম কুলে জন্মগ্রহণ করে।

অতঃপর উত্তমের উত্তম ব্রহ্মতেজ যুক্ত ব্রাহ্মণজন্ম লাভ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ জন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। অতএব ব্রাহ্মণ জন্ম দ্বারাই আত্মার ত্রাণ করিবার অধিকারী হইয়া থাকে। অতএব স্বধর্ম-অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্মদ্বারা আত্মার ত্রাণ করিতে পারিলে আর চুরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিতে হইবে না।

প্রতিবেশীর জীবনরক্ষা, পার্শ্ববর্তী দ্রব্যাদি রক্ষা, পরোপকার, পরহিতে জীবন পর্যন্ত পণ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সকল প্রাণীকে অভয় প্রদান, তাহাদের জীবনরক্ষা, সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার, মানবোচিত ধর্ম কর্মে জীবন অতিবাহিত করা ইত্যাদি শুভ কর্মই মনুষ্য জীবনের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিৎ।

যাঁহারা পরমার্থ বিষয়ে চিন্তা করেন, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ যাঁহাদের কাম্য, সর্বত্র এবং সর্বজীবে ভগবান বিরাজ করেন এইরূপ যাঁহাদের ধারণা, তাঁহাদের চিত্ত-শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সংযম, খাদ্যাখাদ্যের বিচার করা কর্তব্য, কেননা, খাদ্যের গুণাগুণ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আহার শুদ্ধি দ্বারা রজঃ ও তমোগুণ নষ্ট করিয়া আসুরিকভাব পরিত্যাগ পূর্বক শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইয়া দেবভাব অবলম্বন করিতে পারা যায়। এইরূপ বিশুদ্ধ শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া যিনি সুরথের ন্যায় কর্মী বা সংসারী তিনি কর্মক্ষেত্রে সংসারে প্রবেশ করিবেন; যিনি সমাধি বৈশ্যের ন্যায় জ্ঞানী বা মুমুক্ষু তিনি মোক্ষ মার্গ অবলম্বন করিবেন; তাহা হইলে অবলম্বিত কার্যে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে।

কৃত কর্মফল ভুঞ্জিতে হইবে।
কর্ম অনুযায়ী ফল প্রসবিবে॥
শুভ কর্মে শুভ, মন্দে মন্দ ফল,
এ নিয়ম রোধে নাহি কার বল॥
এ মর জগতে সাকার যে জন।
শৃঙ্খল তাহার অঙ্গের ভূষণ॥
সব ব্রহ্ম কিন্তু নানা নাম ধরে।
নিত্য মুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে॥
জানো তত্ত্ব মনে কোরোনা ভাবনা,
ব্রহ্ম সর্বময় ব্রহ্ম ঘোষণা॥
বহুত্বে একত্ব লইবে বুঝিয়া।
পিয় প্রেমরস আকণ্ঠ পুরিয়া
সকলেতে তিনি তাঁহাতে সকল।
চিন্তিবে সতত তাঁহাকে কেবল॥

আত্মতত্ত্ব দ্বারা মনকে আত্মার উপাধি বলিয়া বুঝিতে পারিলেই

সংসারে তাপের কারণ এই ষড়রিপু সংযুক্ত মন মমতা জন্মাইতে পারে না; সুতরাং আপনা হইতে সংসারে তাপ নিবারণ হয়। তীরের নিকটবর্ত্তী হইয়াও যে ব্যক্তি সাবধান না হয় এবং সে যেমন নদীগর্ভে পতিত হয় তদ্রূপ সর্ব্বদা কাম ক্রোধ ইত্যাদির বশীভূত হইয়া থাকিলে তাহার মনুষ্য জীবন বিফল হয়; কারণ সে হিতাহিত জ্ঞান হারায় ফলে পাপস্রোত তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়, আর আত্মত্রাণের উপায় থাকে না। কর্ম দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় করিতে হইলে শত জন্মের প্রয়োজন; আবার সেই শত জন্মের কর্ম্মের যে ফল হইবে তাহার ভোগকাল সীমাবদ্ধ করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব এমন একটি সহজ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে নূতন কর্ম্মের আর ফলভোগ হইবে না অথচ তাহা দ্বারা প্রারব্ধও ক্ষয় হইয়া যায়। জ্ঞান ও বৈরাগ্যই ইহার প্রধান উপায় কিন্তু পূর্ব্ব সঞ্চিত প্রারব্ধের প্রাচুর্য্য এতই বেশী যে, তাহা অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষয় হওয়া সম্ভব নয়। অতএব প্রারব্ধ কর্ম্মের নিয়ামক যিনি, তাঁহার শরণাগত হওয়াই কেবল একমাত্র প্রারব্ধ ক্ষয় করিবার উপায়। ঈশ্বর কর্ম্মই একমাত্র পথ, কর্ম্ম হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে মুক্তি।

দেহ অনিত্য হইলেও আত্মার খাঁটি মঙ্গল অর্থাৎ মোক্ষ-সম্পাদনের নিমিত্ত দেহই তো একমাত্র সাধন; অতএব আত্মহত্যা করা অথবা অপর কাহাকে বধ করা, এই উভয়ই শাস্ত্রানুসারে মহাপাপ। দেহ সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করিতে হইবে। কেননা আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতে হইলে দেহ নীরোগ ও সুষ্ঠু রাখিতে হইবে; কিন্তু অতিশয় বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

প্রেম, শ্রদ্ধা, ব্যাকুলতা প্রভৃতি মনোবৃত্তির সাহায্য ব্যতীত কেবল বুদ্ধি বিচার্য্য জ্ঞান কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারে না। একটি বটবৃক্ষের বীজ ভাঙ্গিয়া দেখিলে ভিতরে অনেক ক্ষুদ্র বীজ বা দানা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্য হইতে একটি বীজ অর্থাৎ দানা লইয়া ভাঙ্গিয়া দেখিলে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। "এই যে কিছুই দেখিতে

পাওয়া যায় না," তাহা হইতেই ঐ প্রকাণ্ড বটগাছ হইয়াছে, ইহার উপর বিশ্বাস রাখিতে হইবে অর্থাৎ এ কল্পনা শুধু বুদ্ধির উপর না রাখিয়া উহার বাহিরেও যাইতে হইবে অর্থাৎ তত্ত্বকে নিজের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

সূর্য কাল সকালে উদয় হইবে এই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইবার জন্য শেষে শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস আবশ্যক হয়। তদ্রূপ জগতের মূলকারণ অনাদি অনন্ত সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম আছেন ইহা প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে, পরে প্রেম ও শ্রদ্ধার পথ ধরিতে হইবে। একব্যক্তি যাহাকে সে মা বলিয়া ডাকে, দেবতার ন্যায় পূজা করে, বন্দনা করে সেবা শুশ্রূষা করে, ক্ষুধা পাইলে তাহার নিকট খাইতে চায়, সেই মাকে আবার আর একজন লোক সাধারণ স্ত্রীলোক বলিয়া মনে করে। ইন্দ্রিয়াতীত হওয়ায় যে-পদার্থ বিষয়ে চিন্তা করা যায় না তাহার স্বরূপের নির্ণয় বুদ্ধিদ্বারা কিংবা তর্কদ্বারা সাধিত হয় না।

যদি ইহাই এক বাধা হয় যে, নির্গুণ পরম ব্রহ্মকে জানা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন, তবে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে মতভেদ হইলে পরও শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের দ্বারা এই বাধা দূর করা যাইতে পারে। কারণ এই ব্যক্তিদের মধ্যে যে অধিক বিশ্বাসনীয় হইবে তাহার বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া কাজ করিলেই চলিয়া যাইবে। তর্কশাস্ত্রে এই পথকে "আপ্তবচন প্রমাণ" বলে। জাগতিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হাজার হাজার লোক আপ্ত বাক্যের উপর বিশ্বাস রাখিয়াই আপন আপন কাজ করিয়া যাইতেছে।

হিমালয় পর্বতের উচ্চতা পাঁচ কি দশ মাইল, ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এরূপ ব্যক্তি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি হিমালয়ের উচ্চতা কত, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে স্কুলের ভূগোল পুস্তকে পঠিত ২৯০০২ ফুট এই অঙ্ক আমাদের মুখ হইতে চট্ করিয়া বাহির হইয়া

যায়। সেইরূপ, "ব্রহ্ম কিরূপ?" জিজ্ঞাসা করিলে 'তিনি নিগুর্ণ' বলিতে বাধা কি? ব্রহ্ম সত্যসত্যই নিগুর্ণ কি না তাহার সম্যক অনুসন্ধান করা বুদ্ধির অতীত। ভাস্করাচার্য্য ও পরে নিউটনের মনে মাধ্যাকর্ষণের কল্পনা আসার পূর্বেই গাছের ফল নীচে পৃথিবীর উপর পড়ে, একথা অনাদি কাল হইতে সকলের জানা ছিল। জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মের স্বরূপের মীমাংসা করিয়া ব্রহ্ম নিগুর্ণ এইরূপ নির্দ্ধারণ করিবার পূর্বেই মনুষ্য কেবল আপন শ্রদ্ধার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, জগতের মূলে নশ্বর ও অনিত্য জাগতিক পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন এক আদি-অন্তহীন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী তত্ত্ব আছে এবং মনুষ্য সেই সময় অবধি কোন না কোন আকারে তাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে। এই জ্ঞানের উপপত্তি সেই সময় মনুষ্য দিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু প্রথমে বিশ্বাস, অনুভব ও পরে উপপত্তি এই ক্রম অর্থাৎ প্রণালী দেখা যায়।

যাহারা ভোগে আসক্ত এবং তদনুযায়ী তাহাদের রুচি পরিতৃপ্ত করার জন্য খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না,—তাহাদের পক্ষে আহার শুদ্ধির প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু একথা সত্য যে, বেদ বিহিত কুতকর্মের ফলে মানুষ আপন আপন অভীষ্ট লাভে সফল হয়। পুণ্য-কর্মের ফলে মানুষ স্বর্গীয় সুখ সমৃদ্ধি লাভ করে। এই পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান বা জ্ঞানানুশীলন করিতে গেলে মনের চাঞ্চল্য ও মলিনতা আহার শুদ্ধি দ্বারা করিতে হইবে। রজো ও তমোগুণ খাদ্য দ্বারা নাশ করিয়া সত্বগুণের আশ্রয় লইতে হইবে। যাহারা কর্মানুষ্ঠান বা জ্ঞানানুশীলন করে না তাহারা দীর্ঘকাল দুঃসহ যম যাতনা ভোগ করে। কর্মও চাই, জ্ঞানও চাই; কর্মের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন বা উপাসনা চলিলেই জীব ক্রমশঃ আপনার অভীষ্ট পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে।

জগতে চিরদিন জীবকে দুঃখের অভিঘাত সহিতে হইতেছে। রোগাদির জন্য শারীরিক দুঃখ, কাম ক্রোধাদির জন্য মানসিক দুঃখ,—মানুষ, পশু,

স্থাবর ও জঙ্গম হইতে আমরা দুঃখ পাই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি হইতে আমরা দুঃখ পাই। জীব যতদিন শরীর ধারণ করে ততদিন তাহাকে জরা মরণ জন্য দুঃখভোগ করিতেই হয়, অতএব দুঃখভোগ জীবের স্বভাব সিদ্ধ। দুঃখের নিবৃত্তি সকলেরই অভিপ্রেত; কিন্তু সাময়িক নিবৃত্তিতে বিশেষ লাভ নাই। অতএব দুঃখ নিবৃত্তি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক হওয়া আবশ্যক। ইহাই জীবের পরমার্থ।

দেখা যায়, লৌকিক উপায়ে এরূপ নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। কারণ ঔষধ সেবনে শারীরিক দুঃখের বা ইষ্টসাধনে মানসিক দুঃখের যে নিবৃত্তি ঘটে তাহা সাময়িক মাত্র, স্থায়ী হয় না। দুঃখ নিবারণের আর একটি বৈদিক উপায় প্রচলিত আছে বটে; বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের ফলে জীব সুখধাম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু সে উপায়ও সমীচীন নহে। কারণ তাহা ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট। কর্মের তারতম্য অনুসারে অর্জিত স্বর্গলোকেরও তারতম্য ঘটে। তাহার ফলে কেহ উচ্চতর, কেহ নিম্নতর স্বর্গের অধিকারী হয়; তাহাতে পরস্পরের উৎকর্ষ অপকর্ষের ভেদ দর্শনে স্বর্গবাসীর হৃদয়ে দুঃখানুভব অপরিহার্য। দ্বিতীয় কথা, যজ্ঞ সাধনের জন্য যাজ্ঞিককে জীবহিংসা করিতে হয়। অতএব হিংসা বহুল যজ্ঞানুষ্ঠানে যেমন পুণ্য আছে, তেমনি পাপের স্পর্শও সুনিশ্চিত; আর সেই পাপের ফলে, দুঃখভোগ অনিবার্য। কিন্তু বৈদিক উপায়ের মারাত্মক ত্রুটি এই যে, যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহার ভোগ স্থায়ী হয় না। পুণ্যকর্মের ফল ভোগান্তে কর্মীর পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব কর্মীকে আবার দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। দুঃখনিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক উপায় যেমন যথেষ্ট নহে, তেমনি বৈদিক উপায়ও যথেষ্ট নহে। অতএব দুঃখ নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়—জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞানান্মুক্তি (সাংখ্য সূত্র ৩।২৩)। আমাদের শুধু অনুভব করিতে হইবে যে, আমরা ক্রমোন্নতিশীল জীব অর্থাৎ ক্রমশঃই আমাদিগকে উন্নতির

পথে আগাইয়া যাইতে হইবে। বলিষ্ঠ মনোভাব লইয়া ইহলৌকিক উন্নতি (worldly advancement) এবং পারলৌকিক উন্নতি (Hevenly advancement) এই উভয়বিধ উন্নতি সাধন করিতে হইবে। মনুষ্য জীবনে এই দুইটি চরম লক্ষ্য।

সুখ পাইবার জন্য কিংবা প্রাপ্ত সুখের বৃদ্ধির জন্য, দুঃখ নিবারণ বা লাঘব করিবার জন্য প্রত্যেক মনুষ্য এই জগতে সর্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহলোকে কিংবা পরলোকে সমস্ত প্রবৃত্তি সুখের নিমিত্ত; ইহার অতিরিক্ত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের কোন ফল নাই, (মহাঃ শাঃ পর্ব)। মনুষ্য প্রকৃত সুখ কিসে হয় ইহা না বুঝিবার দরুন মিথ্যা সুখকেই সত্য বলিয়া মনে করে; এবং আজ না হয় কাল সুখ নিশ্চয়ই মিলিবে এই আশায় ভর করিয়া জীবন কাটাইতে থাকে; কিন্তু এই আশা পূর্ণ হইতে না হইতে তাহাকে সংসার ছাড়িয়া মৃত্যুর কবলে পড়িতে হয়। তথাপি সে সাবধান না হইয়া পুনর্বার তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। এইভাবে এই ভবচক্র চলিতেছে, কেহই প্রকৃত ও নিত্য সুখ কি তাহার বিচার করে না। আপনার যাহা কিছু ইষ্ট ও অনুকূল তাহাই সুখ এবং যাহা কিছু আমরা চাহিনা, যাহা আমাদের প্রতিকূল তাহাই দুঃখ। সর্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি করা এবং আত্যন্তিক ও নিত্য সুখ অর্জন করাই পুরুষের পুরুষার্থ।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্

(গীতা ৬।২১)

অর্থাৎ যাহা কেবল বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় তাহাই আত্যন্তিক সুখ।

সংসারে সুখদুঃখ সর্বদাই একের পর আর এক আমরা ভোগ করি এবং এখানে সুখ অপেক্ষা দুঃখেরই পরিমাণ অধিক। চাঁদকে ধরিবার জন্য ছোট ছেলে আকাশে হাত বাড়াইলেও সে যেরূপ চাঁদকে হাতের

মুঠিতে আনিতে পারেনা, সেইরূপ আত্যন্তিক সুখের আশায় কেবল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়-উপভোগ রূপ সুখের অনুসরণ করিলেও অত্যন্ত সুখ প্রাপ্তি ঘটে না। এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সুখই সকল প্রকার সুখের ভাণ্ডার নহে; কেননা ইহা অনিত্য ও ক্ষণিক, শারীরিক ও মানসিক সুখের এই দুই ভেদ। শরীরের কিংবা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার অপেক্ষা শেষে মনেরই অধিক গুরুত্ব স্বীকার করিতে হয়। শারীরিক সুখ অপেক্ষা মানসিক সুখের যোগ্যতা অধিক এবং মনের সুখ অপেক্ষা বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সুখ শ্রেষ্ঠ। পশুদিগের ইন্দ্রিয় সুখের আনন্দ যদি মনুষ্যেরই সমান হইত এবং বিষয়ভোগই এই জগতে প্রকৃত সুখ মনুষ্যের যদি এই ধারণাই হইত, তাহা হইলে পশু ও মানুষে কোন পার্থক্য থাকিত না। কিন্তু তাহা নহে, পশু ও মানুষের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বটি কি—তাহা বুঝিতে হইলে, মন ও বুদ্ধির দ্বারা আপনার নিজের ও বাহ্য জগতের জ্ঞান যাহা দ্বারা লাভ করা যায় সেই আত্মজ্ঞান আবশ্যক। সেই জ্ঞান এইরূপ—পশু ও মনুষ্য এই উভয়ের ইন্দ্রিয় ভোগ্য সুখ একই প্রকারের; কিন্তু পশুদিগের মধ্যে আত্মা সর্বদা ঘুমাইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের মন ও বুদ্ধির বিকাশ হয় না। সুতরাং তাহাদের ইন্দ্রিয় সুখ ব্যতীত অন্য কোন আত্ম সুখের ধারণা নাই; কিন্তু মানুষ যে শুদ্ধাবস্থায় আত্যন্তিক সুখ লাভ করে তাহা আত্মবশ। ইহার প্রাপ্তি কোন বাহ্যবস্তুর উপর নির্ভর করে না। ঐ সুখ আপনারই প্রযত্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং যেমন যেমন আমার উন্নতি হইতে থাকে, তেমন তেমন এই সুখের মাত্রাও অধিক হইতে অধিকতর শুদ্ধ ও নির্মল হইতে থাকে। ভর্তৃহরি সত্যই বলিয়াছেন—"মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ" অর্থাৎ মন প্রসন্ন হইলে দরিদ্রই বা কে, ধনবান্ই বা কে—দুই-ই সমান। আজ যাহা ইন্দ্রিয়ের সুখজনক বলিয়া সুখ মনে করি, কল্য তাহা কোন কারণে দুঃখজনক হইতে পারে।

গ্রীষ্মকালে যে ঠাণ্ডাজল মিষ্ট লাগে তাহাই শীতকালে আর পান করা যায় না।

নিত্য ব্যবহারে সুখের অর্থ—ইন্দ্রিয় সুখই বুঝায়। আত্মজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মে অনুভূতি লাভ হইলে যে পরম শান্তি লাভ হয় সেই শান্তিই পরম শান্তি, ইহাই শ্রেষ্ঠ সুখ; কিন্তু সকল ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হইলেও লৌহ প্রভৃতি অন্য ধাতু ব্যতীত স্বর্ণ দ্বারা সংসারের সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় না; কিংবা চিনি অত্যন্ত মিষ্ট হইলেও লবণ বিনা যেমন কাজ চলে না, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক সুখ বা শান্তির বিষয়ও বুঝিতে হইবে। এই শান্তির সহিত অন্ততঃ শরীর ধারণার্থও কোন কোন ঐহিক পদার্থের প্রয়োজন আছে, ইন্দ্রিয়গুলিরও প্রয়োজন আছে। আশীর্বাদের শান্তির বাক্যে যেরূপ "পুষ্টি ও তুষ্টি" শব্দের প্রয়োগ আছে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই। শান্তি বাক্যের মূল অর্থ এই যে—শান্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি এই তিনই যোগ্য পরিমাণে তুমি প্রাপ্ত হও এবং এই তিনই পাইবার জন্য তুমি যত্নবান হও। কঠোপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে যে নাচিকেত যখন যমদর্শনে যমপুরী গিয়াছিলেন তখন যম তাঁহাকে কোন তিনটি বর লইতে বলেন। নাচিকেত প্রথমে "আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান কর" এরূপ না বলিয়া "আমার পিতা যেন আমার উপর প্রসন্ন হন" এইবর চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর চাহিলেন—"আমায় ঐহিক সুখ সমৃদ্ধি-উৎপাদক যজ্ঞাদি কর্মের জ্ঞান প্রদান কর"। এই দুই বর প্রাপ্ত হইবার পর তিনি যমের নিকট তৃতীয় বর চাহিলেন—"আমাকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দাও, যাহাতে আত্যন্তিক সুখ লাভ হয়, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই আমাকে বল।" সুতরাং এই ব্রহ্মজ্ঞানই আত্যন্তিক সুখ ইহাই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আত্মারূপী ব্রহ্ম সর্বত্রই আছেন; মানুষের ভিতর যেমন আছেন প্রস্তরের মধ্যেও তেমনি আছেন। দীপ একই, কিন্তু সেই দীপ যদি

লৌহ আবরণের মধ্যে থাকে তবে তাহার প্রভা বা আলো বাহিরে প্রকাশ পায় না ; কিন্তু স্বচ্ছ কাচের ভিতর অর্থাৎ লণ্ঠনের ভিতর থাকিলে উহার প্রভা বা আলো বাহিরে প্রকাশ পায়। আবরণ ভেদে ঐ দীপের প্রভার ভেদ হয়, তারতম্য ঘটে। সেইরূপ আত্মতত্ত্ব সর্বত্র একই হইলেও নামরূপাত্মক আবরণের তারতম্য ভেদে অচেতন ও সচেতন এই ভেদ হইয়া থাকে। সচেতনের মধ্যেও মনুষ্যের যেরূপ জ্ঞান আহরণের শক্তি আছে, উপায় জানিয়া লইতে পারে এবং সেই জ্ঞান নিজের জীবনে রূপায়িত করিয়া মুক্তিলাভের সন্ধান পাইতে পারে, পশুর তাহা নাই, কেননা আধার অনুসারে শক্তি-সামর্থ জন্মে। আত্মা সর্বত্র একই সত্য কিন্তু তথাপি তাহার মূলে নির্গুণ ও উদাসীন হওয়ায় মন, বুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা সাধন ব্যতীত আত্মা নিজে কিছুই করিতে পারে না। এইসকল সাধন মনুষ্য যোনি ব্যতীত অন্যত্র পূর্ণরূপে না থাকায় মনুষ্য-জন্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। মনুষ্যের দুইটি দেহ—স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ। মনুষ্যের কর্মফল এই সূক্ষ্মদেহে অবস্থিতি করে এবং আত্মা স্থূলদেহ ছাড়িয়া গেলে এই কর্মও লিঙ্গশরীর অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ দ্বারা তাহার সঙ্গে গিয়া আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন জন্মগ্রহণ করায়।

ব্রহ্মসত্য—জগৎ মিথ্যা। ইহার তাৎপর্য এই যে, আমরা জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখি, যেমন—মনুষ্য, গো, পশু, পক্ষী, স্থাবর, জঙ্গম ইত্যাদি। এই যে বিভিন্ন রূপ দেখা এবং ইহাদের জন্য আমাদের বিভিন্ন ভাব, ইহা সবই মিথ্যা। ব্রহ্মই বৈচিত্র্যময় জগৎ বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। জ্ঞানীর পক্ষে জগৎ ব্রহ্মময় ; অজ্ঞানীর পক্ষে জগৎ বলিয়া, মায়া বলিয়া বোধ হইতেছে। মেঘ, বরফ, ফেন, বুদ্‌বুদ তরঙ্গাদি মিথ্যা, জল সত্য। মেঘ, বরফ ইত্যাদি যখন গলিয়া জলে মিশিয়া যায়, তখনও তাহা জল এবং যখন ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে প্রকাশমান তখনও জল। জ্ঞানী ব্যক্তি জলই দেখিবেন ; অজ্ঞানী মেঘ বরফ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিবেন।

পরব্রহ্ম জীব ও বহির্জ্যোতিরূপে প্রকাশমান হইয়াও নির্বিশেষ (Homogenious) সর্বব্যাপী, নিরাকার, সাকার, পূর্ণ, অসীম, অখণ্ডাকার, পূর্ণরূপে বিরাজমান ; এইরূপ অনুভবকে জীবের মায়াত্যাগ বলে।

মানুষের প্রত্যেকের ভাব ভিন্ন ভিন্ন। এই সকল বিভিন্ন ভাব লইয়া মানুষ জন্মিয়া থাকে ; সে কখনও ঐসকল ভাব অতিক্রম করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সহজ সাধ্য নহে—দুঃখকে অতিক্রম করিতে হইলে সংযমী ও ধৈর্যশীল হইতে হইবে।

পরিশিষ্ট

১। পিতৃপদবাচ্য—জন্মদাতা কন্যাদাতা অন্নদাতা অভয়দাতা মন্ত্রদাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই ছয় জন।

২। পঞ্চ যজ্ঞ—

(১) ব্রহ্মযজ্ঞ—শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা।

(২) দেবযজ্ঞ—অর্চ্চনা, ফল, মূল দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন।

(৩) পিতৃযজ্ঞ—তর্পণ, ফল, মূল, দুগ্ধ ইত্যাদি সেই উদ্দেশে দান।

(৪) নৃযজ্ঞ—অতিথি সৎকার।

(৫) ভূতযজ্ঞ—পশু, পক্ষী ইত্যাদিকে খাদ্যদান।

৩। পঞ্চ প্রাণ—

(১) প্রাণ—হৃদয়ে অবস্থিত। ইহার কর্ম—নিশ্বাস-প্রশ্বাস, উচ্ছ্বাস ও পিপাসা।

(২) অপান বায়ু—গুহ্যদেশে। কর্ম—মল, মূত্র ত্যাগ।

(৩) সমানবায়ু—নাভিতে। কর্ম—ভুক্ত অন্নাদি পরিপাক দ্বারা সার অসার ভাগ বিভাগ করা।

(৪) উদানবায়ু—কণ্ঠে। কর্ম—ভক্ষ্যদ্রব্য উদরস্থ করা।

(৫) ব্যান বায়ু—সর্বাঙ্গে। কর্ম—ভুক্ত অন্নাদির রস সর্ব শরীরে সঞ্চালন ও পোষণ।

৪। পঞ্চ বায়ু—নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়।

দেহের বহির্ভাগে এই পঞ্চ বায়ু আছে, তাহাদের পুষ্টির জন্য ভোজন সময়ে মাটিতে পাঁচ ভাগ অন্ন ও জল দেওয়া হয়।

ইহাদের কর্ম যথা—নাগবায়ু উদ্গারে। কূর্মবায়ু—উন্মিলনে। কৃকরবায়ু ক্ষুতে। দেবদত্তবায়ু—জৃম্ভনে ও ধনঞ্জয়বায়ু—শব্দ উচ্চারণে।

৫। দশ মহাবিদ্যা :—

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা।

৬। দশ অবতার :—

মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

৭। পিতামাতার অন্নভুক্ত রস হইতে সন্তানে যাহা যাহা বর্তে :—

পিতৃজ—স্নায়ু, মজ্জা, অস্থি, শ্মশ্রু, রোম, কেশ, শিরঃ, ধমনী, নখ, দন্ত ও শুক্র।

মাতৃজ—রক্ত, মাংস, ত্বক, মেদ, প্লীহা, যকৃত, গুহ্যদেশ, নাভি।

ধাতুজ—বুদ্ধি, বর্ণ ও উৎসাহ।

আত্মজ—অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মজ—সুখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম ইত্যাদি।

৮। কর্ম কি ?

ঈশ্বর জাগেন মনে যে কর্মে কেবল
সে কর্মই কর্ম, আর কুকর্ম্ম সকল।

৯। যে রাম নাম করা হয়, সে কোন্ রাম ?

উত্তর—কবীর প্রভৃতি সাধকবৃন্দ রহস্যবাদী ছিলেন। তাঁহারা রূপময় রামকে গ্রহণ না করিয়া "নামময়" রামকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাধনা নাম লইয়া। তাঁহাদের মতে রূপময় রাম দশরথ তনয় অবতারী রাম।

নামময় রাম হইলেন নিরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম রাম। তাঁহারা সকলে অন্তর্যামীকে এই নামে ডাকিতেন।

১০। মহামায়া ও যোগমায়া কাহাকে বলে ?

উত্তর—মহামায়া যিনি বিমুখ মোহিনী, ভুলায় কৃষ্ণকে। ঐশী শক্তি মহামায়া, যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যারূপিনী এবং শক্তি ও শক্তিমানে অভিন্ন। তিনি অবিদ্যারূপে জগৎকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখেন এবং বিদ্যারূপে মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন।

যোগমায়া—যিনি উন্মুখ মোহিনী, মিলায় কৃষ্ণকে।

১১। সভ্যতা ও সংস্কৃতি কাহাকে বলে :—

উত্তর—সভ্যতা (Civilization) প্রাত্যহিক জীবনে খাদ্য, পরিচ্ছদ, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবিকা প্রভৃতি বাস্তব বিষয়গুলির ক্রমোন্নতি। তাহার আশ্রয়-শ্রম, আবিষ্কারিণী প্রতিভা ও বিজ্ঞান। সংস্কৃতি (Culture)-প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গেই মহত্ত্বের সমাবেশ। তাহার আশ্রয়-চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতি।

এক—জীবনকে লইয়া যায় সম্মুখে আগাইয়া।

আর এক—জীবনকে লইয়া যায় আশা, সৌন্দর্য ও শ্রী।

Dance, drama, and music alone do not constitute culture, culture is the way of life of a nation.

১২। সুকৃতিপরায়ণ চার প্রকার ব্যক্তি ভগবানের ভজনা করে (গীতা ৭—১৬)

(১) আর্ত্ত—(যেমন—কুরু সভায় দ্রৌপদী)

(২) জিজ্ঞাসু—(যেমন—উদ্ধব, অর্জুন)

(৩) অর্থার্থী—(উত্তম স্থানের আকাঙ্ক্ষা, যেমন—ধ্রুব)

(৪) জ্ঞানী—(যেমন—প্রহ্লাদ, শুকদেব, নারদ ইত্যাদি)

১৩। ষড়ৈশ্বর্য—ঐশ্বর্য, শক্তি, যশঃ, রূপ, জ্ঞান, বৈরাগ্য।

১৪। অষ্টসিদ্ধি :—

(১) অণিমা—স্বীয় শরীরকে সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা।

(২) লঘিমা—স্বীয় শরীরকে হাল্কা করিবার ক্ষমতা।

(৩) ব্যাপ্তি—স্বীয় শরীরকে বিস্তৃত করিবার ক্ষমতা।

(৪) প্রাকাম্য—ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা।

(৫) মহিমা—স্বীয় শরীরকে স্থূল (ভারী) করিবার ক্ষমতা।

(৬) ঈশিত্ব—ঈশ্বরত্ব, স্বামীত্ব, রূপ, ঐশ্বর্য লাভ করা।

(৭) বশিত্ব—সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা।

(৮) কামবশায়িত্ব—কাম রিপুকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা।

১৫। নবধা ভক্তি কি কি?

উত্তর—শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোস্মরণং পাদসেবনং।

অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনম্॥

১৬। প্রদোষ অর্থ কি?

সূর্য্যাস্তের পর চার দণ্ড সময়কে প্রদোষ বলে। ২৪ মিনিটে ১ দণ্ড, অতএব ৪ দণ্ড × ২৪ = ৯৬ মিনিট অর্থাৎ অস্তের পর ১॥ ঘণ্টা।

১৭। হরিতালিকা বা নষ্ট চন্দ্রের তাৎপর্য :—

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি সত্রাজিৎ সূর্য্যের আরাধনায় সমন্তক মণি প্রাপ্ত হন। ঐ মণি প্রতিদিন বহুরত্ন প্রসব করে এবং দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি নিবারণ করে; কিন্তু অশুচি অবস্থায় ধারণ করিলে প্রাণ নাশ করে। রাজা উগ্রসেন মণিটির জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে উহা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। সত্রাজিৎ তাহার ভ্রাতা প্রসেনকে উহা দিয়াছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। একদিন প্রসেন ঐ মণিটি কণ্ঠে ধারণ করিয়া মৃগয়ার্থে বনে যায়। একটা সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়া যখন যক্ষরাজ জাম্বুবানের গুহদ্বার হইয়া যাইতেছিল, এমন সময়, জাম্বুবান সিংহটাকে বধ করিল এবং মণিটি লইয়া সুকুমার নামক নিজ পুত্রকে দেয়। এদিকে প্রসেন নিজ গৃহে প্রত্যাগমন না করায় সকলে কাণাকাণি করে যে, মণির লোভে শ্রীকৃষ্ণ প্রসেনকে বধ করিয়াছে। ঐ দিন নষ্ট চন্দ্র ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ ঐ চন্দ্র দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মণি বিষয়ক অপকলঙ্ক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সৈন্য-সামন্ত লইয়া ও কতিপয় প্রধান ব্যক্তি সহ প্রসেনের অনুসন্ধানের নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। পরে যখন জাম্বুবানের গুহাদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন দেখিতে পাইলেন—

শিশুপুত্র সুকুমারের ধাত্রীমাতা শিশুকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছে যে, বাছা, কাঁদিস্ না, কাঁদিস্ না, এই মণি লইয়া খেলা কর। এই মণি তোর পিতা জাম্বুবান, সিংহকে বধ করিয়া লইয়াছে। তখন উপস্থিত সকলে প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিল। শ্রীহরি (কৃষ্ণ) হাতে তালি দিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ যেন ঐ চন্দ্র দর্শন না করে। অন্যথায় ঐরূপ মিথ্যা কলঙ্ক ভোগ করিতে হইবে। শ্রীহরি তালি দ্বারা জানাইয়াছিলেন বলিয়া হরিতালিকা।

১৮। দোল পূজায় বহ্ন্যুৎসব বা চাঁচর—তাৎপর্য :—

মেষরূপী একটা অসুর দোলের পূর্ব্বদিনে শ্রীকৃষ্ণের তাড়নায় প্রচুর তৃণময় বনের মধ্যে প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বন বেড়িয়া অগ্নি দিয়াছিলেন। অগ্নির প্রভাবে বন উজ্জ্বল হওয়ায় সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল।

১৯। পঞ্চগব্য :—

মহাভারতে (অনুশাসন পর্ব্ব ৮২ অধ্যায়) উক্ত হইয়াছে—এক সময়ে লক্ষ্মীদেবী আত্মপরিচয় দিয়া গাভীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা সকল দেবতাকেই স্বীয় অঙ্গে স্থান দিয়াছ, আমাকেও একটু স্থান দাও; আমার সংসর্গে তোমাদের শ্রী বৃদ্ধি হইবে। গাভীরা বলিল—"আমাদের শ্রীর অভাব নাই। তুমি চঞ্চলা ও সাধারণের ভোগ্যা; তোমার সংসর্গ আমরা ইচ্ছা করি না। তুমি দূর হও।" লক্ষ্মীদেবী অনুনয় করিয়া বলিলেন—"তোমরা অবজ্ঞা করিলে জগতের সকলেই আমাকে অবজ্ঞা করিবে; অতএব আমাকে তোমাদের কোনও কুৎসিত অঙ্গেও স্থান দিয়া সম্মানিত কর।" গাভীরা তখন প্রসন্ন হইয়া তাহাদের মল মূত্রে বাস করিতে অনুমতি দিল, লক্ষ্মীও তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র—একত্র যোগে পঞ্চগব্য হয়।

বৈজ্ঞানিক মতে—গোময়, গোমূত্র রোগ বীজাণুনাশক, ফিনাইলের ন্যায় কাজ করে (Disinfectant).

২০। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং ইঃ ব্যাখ্যা :

নারায়ণকে, নরোত্তম নরকে (পরমাত্মাকে) এবং দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় (অর্থাৎ পুরাণাদি গ্রন্থ) পাঠ করিবে। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, বিষ্ণুধর্ম্ম, শিবধর্ম্ম, সৌরধর্ম্ম, মহাভারত ইহাদের নাম জয়। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণকেও জয় বলে। ঐ শাস্ত্র সমষ্টির নাম জয়। উদীরয়েৎ উচ্চারয়েৎ। ভাগবত, গীতা ইত্যাদি পাঠের বেলায় ব্যাসং এবং পুরাণাদি পাঠের বেলায় সরস্বতীঞ্চৈব বলিবে।
(শ্রীশ্রীচণ্ডী)

নর অর্থে জীবাত্মা, নরোত্তম অর্থে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে।

২১। ছুরি ও যাতির আবশ্যকতা :—

মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাংলাদেশে যাতি থাকে। অর্থাৎ এই শক্তি স্বরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছিন্ন করিবে। এটি বীরভাব। (শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বাণী)

২২। কর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (গীতা ১.১) অর্থ :—

কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র হইল কিরূপে ? :—

উত্তর—হস্তিনাপুরের চতুর্দ্দিকে কুরুক্ষেত্রের ময়দান আছে। বর্ত্তমান দিল্লি নগরী এই ময়দানের উপরই সংস্থাপিত। কৌরব পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বপুরুষ কুরুনামে এক রাজা এই ময়দানে অত্যন্ত কষ্টের সহিত হল চালনা করিতেন ; উদ্দেশ্য অপরকে এই কার্যে উৎসাহিত করা ; তাই ইহাকে ক্ষেত্র বা ক্ষেত বলা হইত। রাজা কুরুর নামে কুরুক্ষেত্র হইয়াছে।

ইন্দ্র রাজা কুরুকে এই বর প্রদান করিলেন যে, এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তপস্যা করিতে করিতে বা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবে তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে। রাজা কুরু তখন এই ক্ষেত্রে হল চালনা পরিত্যাগ করিলেন এবং তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, (মহাভারত, শল্যপর্ব্ব-৫৩) এইরূপে কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে ইন্দ্রের বর প্রভাবে।

২৩। হস্তরেখা গুলির তাৎপর্য :—

হস্তরেখা ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ (Tips of the fingers) মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ (Mental ability) নির্দ্দেশক। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর, নাট্যকার, হত্যাকারী, আত্মঘাতী ইত্যাদি ভবিষ্যতে কে কি হইবে, সবকিছুই হস্তরেখা দৃষ্টে নির্ভুল ভাবে সামুদ্রিকেরা অর্থাৎ গণনাকারীরা বলিয়া দিতে পারেন।

সাত প্রকার হাত আছে; অঙ্গুলীগুলিও কারো লম্বা কারো খাটো। রেখাগুলিও বিভিন্ন প্রকারের এবং বিভিন্ন লক্ষণের।

The hand is the index of the mind and consiquently of the soul. There are more nerves from the brain to the hand than to any other portion of the system. The tips of the fingers are the termini of the brain nerves. কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে পক্ষাঘাত রোগে (Paralysis) আক্রান্ত হইবার অনেক পূর্ব্বে হস্তরেখাগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়।

It is a wellknown fact that in ceratin cases of Paralysis, long before the attack takes place, the lines on the palm completely disappear, although the hand can continue to fold as before.

(Adopted from Cheirognomy part I).

লোকের ২০।২২ বৎসর বয়সের পর অর্থাৎ পূর্ণ যৌবনে হস্তরেখাগুলি পরিস্ফুট হয়। শৈশব অথবা কৈশোরের হস্তরেখাগুলি ঐ যৌবন সময়ে পরিবর্তন ঘটে; সেই সময় রেখাগুলি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

অঙ্গুলীর অগ্রভাগের আকার এবং পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ফাঁকস্থান দৃষ্টে শুভাশুভ নির্ণয় করা যায়।

২৪। বর্ণ-সংকর :—

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (গীতা ১।৪১)

অর্থাৎ :— অধর্ম্মেতে করে ভ্রষ্টা কুলবধূদের,
ভ্রষ্টানারী হ'তে সৃষ্টি বর্ণ-সঙ্করের।
সেই কুল-হন্তাদের সে কুলের আর,
নরকের তরে হয় হেন ভ্রষ্টাচার।
পিতৃ পুরুষের জল পিণ্ড বিলোপন,
তাহাতে পতিত হন যত পিতৃগণ॥

সকল বর্ণের অনুলোম (অধম বর্ণের স্ত্রী ও উত্তম বর্ণের পুরুষ) ক্রমে যে জন্ম হয়, তাহা বৈধ এবং প্রতিলোম বা বিলোম (উত্তম বর্ণের স্ত্রী ও অধম বর্ণের পুরুষ) ক্রমে যে জন্ম হয়, তাহাকে বর্ণ-সঙ্কর বলে।

অনুলোমেন বর্ণানাং যৎ জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রতিলোমেন যৎ জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণ-সঙ্করঃ॥
(নারদ সংহিতা ১২ পৃষ্ঠা ১৯ শ্লোক)

২৫। অগ্নি সংস্কারে প্রথমে মুখাগ্নি দেওয়ার তাৎপর্য :—

পরলোক গমনের দুইটি উজ্জ্বল মার্গ (গতি) আছে ; একটি—অর্চির মার্গ বা দেবযান ; অপরটি ধূম্রাদি মার্গ বা পিতৃযান। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞান লইয়া অন্তিমকালে দেহত্যাগ করিয়াছে এইরূপ ব্যক্তির ব্রহ্মপদ লাভ হয় এবং সে অর্চির মার্গ বা দেবযান গতি প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি নিছক কর্মকাণ্ডী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে ধূম্রাদি মার্গ বা পিতৃযান গতি প্রাপ্ত হয়। পিতৃযান দেবযান অপেক্ষা নিম্নস্তরের হইলেও তাহাও চন্দ্রলোক অর্থাৎ এক প্রকার স্বর্গলোকেই উপনীত হইবার মার্গ। সেই কারণে ইহলোকে

শাস্ত্রোক্ত কোন প্রকার পুণ্যকর্মের ফলে সেখানকার সুখলাভের যোগ্যতা হয়। (গীতা : ৯।২০, ২১)।

মৃতদেহ অগ্নিতে জ্বালাইয়া দিলে পর অগ্নির জ্যোতি হইতেই এই মার্গের আরম্ভ হইয়া থাকে; তজ্জন্য প্রথমে মুখাগ্নি দেওয়ার প্রথা আছে যাহাতে অগ্নি সেই সেই পথে সত্বর লইয়া যাইতে পারে। জীব কর্ম্মফলে ঐ ঐ গতি পথে গমন করে।

এ ছাড়া আর একটি তৃতীয় মার্গ আছে ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। যাহারা কিছুমাত্র পুণ্যকর্ম না করিয়া সংসারে যাবজ্জীবন পাপকার্য্যে নিমগ্ন থাকে, তাহারা উল্লিখিত দুইটি মার্গের মধ্যে কোনও মার্গ দিয়াই যাইতে পারে না। তাহারা মৃত্যুরপর একেবারেই পশু পক্ষী আদি তির্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ যমলোকে অর্থাৎ নরকে গমন করে। (ছান্দোগ্য-৫।১০, ৮)"

২৬। গৃহে বজ্রপাত ও অগ্নিভয় নিবারণের উপায় :—

ওঁ ইন্দ্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো মহাবলঃ
ঐরাবত গজারূঢ় দেবরাজ নমোঽস্তুতে।
ওঁ জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ
পৌলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চেতে বজ্র বারণাৎ।
ওঁ মুনেঃ কল্যাণ মিত্রস্য জৈমিনিশ্চাপি কীর্ত্তণাৎ
বিদ্যুদগ্নিভয়ং নাস্তি লিখিতাস্য গৃহোদরে।
ইতি শকাব্দা···। সন···। বঙ্গাব্দ।

তালপাতায় লাল অক্ষরে মন্ত্রটি লিখিয়া গৃহের দরজার উপর অথবা চালে টাঙ্গাইয়া রাখিলে বজ্রপাত ও অগ্নিভয় থাকে না। প্রতিবৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে ইহা করিতে হয়। মন্ত্রটি অতি দুষ্প্রাপ্য তজ্জন্য উল্লেখ করা হইল।

হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ

১। **গীতা—**

(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
(২) পিঙ্গল গীতা
(৩) সম্পাকী গীতা
(৪) মঙ্কী গীতা
(৫) বোধ্য গীতা
(৬) বিচখ্যু গীতা
(৭) হারীত গীতা
(৮) বৃত্র গীতা
(৯) পরাশর গীতা
(১০) হংস গীতা
(১১) অণু গীতা
(১২) ব্রাহ্মণ গীতা
(১৩) অবধূত গীতা
(১৪) ঈশ্বর গীতা
(১৫) উত্তর গীতা
(১৬) অষ্টাবক্র গীতা
(১৭) কপিল গীতা
(১৮) গণেশ গীতা
(১৯) দেবী গীতা
(২০) পাণ্ডব গীতা
(২১) ব্রহ্ম গীতা
(২২) ভিক্ষু গীতা
(২৩) যম গীতা
(২৪) রাম গীতা
(২৫) ব্যাস গীতা
(২৬) শিব গীতা
(২৭) সূত গীতা
(২৮) গুরু গীতা
(২৯) অর্জ্জুন গীতা
(৩০) ভগবতী গীতা
(৩১) বৈষ্ণব গীতা
(৩২) সপ্তশ্লোকী গীতা
(৩৩) গীতা প্রবচন
(৩৪) গর্ভ গীতা
(৩৫) ব্যাধ গীতা

২। **উপনিষদ—**

(১) বৃহদারণ্যক উপনিষদ
(২) ছান্দোগ্য উপনিষদ
(৩) কেন উপনিষদ
(৪) কঠ উপনিষদ
(৫) ঈশ উপনিষদ
(৬) তৈত্তিরীয় উপনিষদ
(৭) প্রশ্ন উপনিষদ
(৮) মণ্ডুক্য উপনিষদ

(৯) মুণ্ডক উপনিষদ
(১০) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ
(১১) ঐতরেয় উপনিষদ
(১২) গোপালতাপনী উপনিষদ
(১৩) পিণ্ডোপনিষদ
(১৪) ইল্লোপনিষদ
(১৫) কৌষীতকী উপনিষদ

৩। **সংহিতা—**

(১) মনু সংহিতা
(২) ব্রহ্ম সংহিতা
(৩) বৃহৎ সংহিতা
(৪) হারীত সংহিতা
(৫) বৃদ্ধ চাণক্য সংহিতা
(৬) ঘেরন্ত সংহিতা
(৭) বিষ্ণু সংহিতা
(৮) শঙ্খ সংহিতা
(৯) ঋক সংহিতা
(১০) ভৃগু সংহিতা
(১১) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা
(১২) গৌতম সংহিতা
(১৩) নারদ সংহিতা

৪। **পুরাণ—**

(১) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ
(২) বিষ্ণু পুরাণ
(৩) লক্ষ্মী পুরাণ
(৪) অগ্নি পুরাণ
(৫) বায়ু পুরাণ
(৬) শিব পুরাণ
(৭) গরুড় পুরাণ
(৮) মার্কণ্ডেয় পুরাণ
(৯) মৎস্য পুরাণ
(১০) কূর্ম্ম পুরাণ
(১১) বরাহ পুরাণ
(১২) কল্কি পুরাণ
(১৩) পদ্ম পুরাণ
(১৪) স্কন্দ পুরাণ
(১৫) সৌর পুরাণ
(১৬) দেবী পুরাণ
(১৭) নন্দিকেশ্বর পুরাণ
(১৮) কালিকা পুরাণ
(১৯) সিদ্ধার্থ পুরাণ
(২০) বামন পুরাণ
(২১) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

৫। দর্শন—

(১) সাংখ্য দর্শন
(২) পাতঞ্জল দর্শন
(৩) বৈষিশিক দর্শন
(৪) ন্যায় দর্শন
(৫) মীমাংসা দর্শন
(৬) বেদান্ত দর্শন
(৭) চার্ব্বাক্ দর্শন

৬। বেদ—

(১) সামবেদ
(২) ঋক্‌বেদ
(৩) যজুর্ব্বেদ
(৪) অথর্ব্ব বেদ
(৫) ধনুর্ব্বেদ
(৬) হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ

৭। হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ—

(১) শ্রীমদ্‌ভাগবত
(২) রামায়ণ
(৩) মহাভারত
(৪) হরিবংশ
(৫) হরিভক্তিবিলাস
(৬) চৈতন্যচরিতামৃত
(৭) শ্রীশ্রীচণ্ডী
(৮) মহানির্ব্বাণ তন্ত্র
(৯) প্রাণ তোশিনী তন্ত্র
(১০) চিদম্বর তন্ত্র
(১১) কাত্যায়নী তন্ত্র
(১২) কোকশাস্ত্র
(১৩) রতিশাস্ত্র
(১৪) কামশাস্ত্র
(১৫) সম্মোহিনী শাস্ত্র
(১৬) স্মৃতি শাস্ত্র
(১৭) জ্যোতিষ শাস্ত্র
(১৮) যোগশাস্ত্র
(১৯) ব্রহ্মচর্য্য শাস্ত্র
(২০) বৈষ্ণব শাস্ত্র
(২১) নাট্ট শাস্ত্র
(২২) বৃহৎ নীল তন্ত্র
(২৩) কাপিল তন্ত্র

পুরাণ—পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ। উহাতে ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব, নানাবিধ রূপকের সাহায্যে দার্শনিক তত্ত্ব সমূহের বিবৃতি প্রভৃতি বহু বিষয় আছে। বৈদিক বিষয় সর্ব্বসাধারণ বুঝিতে অক্ষম তজ্জন্য পুরাণ লিখিত

হয়। বেদ যে ভাষায় লিখিত তাহা অতি প্রাচীন; সুতরাং সর্ব সাধারণের উহা বোধগম্য নহে। পুরাণ সমসাময়িক লোকের ভাষায় লিখিত। তাহাদিগকে ঐ সকল তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্থূলভাবে রাজা, সাধু ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত ঐ জাতির মধ্যে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। ধর্মের নিত্য সত্য বুঝাইবার জন্য নানাপ্রকার কাহিনীর সাহায্যে সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা পুরাণের প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

অনেকে বলেন—পুরাণ গ্রন্থগুলির গুহ্য অর্থ আছে। ঐ গুহ্যভাবগুলি পুরাণে রূপকচ্ছলে উপদিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ আবার বলেন পুরাণের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কিছুমাত্র নাই। উচ্চতম আদর্শ সমূহ বুঝাইবার জন্য পুরাণকার কতকগুলি কল্পিত চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে মানব-জাতির চরিত্র উচ্চ আদর্শে গঠিত হয়। কিন্তু গভীর ও নিরপেক্ষ মন লইয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় কিছু কিছু ঐতিহাসিক সত্য সকল পুরাণেরই মূল ভিত্তি। পুরাণের উদ্দেশ্য—নানাভাবে পরম সত্য সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া। রামায়ণ বা মহাভারতে যে-ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাম বা কৃষ্ণের থাকা না থাকার উপর নির্ভর করে না; সুতরাং ইঁহাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হইয়াও রামায়ণ মহাভারত সমগ্র মানব জাতির নিকট মহান ভাবসমূহের জন্য প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। রামায়ণ অথবা মহাভারতকার এমন কথা বলেন না যে, বেদ বেদান্তে যাহা কখনও উপদিষ্ট হয় নাই, সেইসব তত্ত্ব তাঁহারা শিখাইতে চান। খৃষ্টধর্ম্ম যীশুখৃষ্ট ব্যতীত, মুসলমানধর্ম্ম মহম্মদ ব্যতীত, বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধদেব ব্যতীত টিকিতে পারে না; কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর একেবারে নির্ভর করে না; যেহেতু হিন্দুধর্ম্ম বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা অথবা কোন এক নির্দিষ্টকালে লিখিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে—যাহা প্রকৃত সত্য, যাহা সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা

ধ্যানযোগে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই সকল সত্যতত্ত্ব বেদে স্থানলাভ করিয়াছে। বেদই হিন্দুদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ।

দশ মাথাযুক্ত দশানন রাক্ষস নামে কোন ব্যক্তি থাকুন আর নাই থাকুন তা দেখার কোন আবশ্যকতা নাই। শ্রীরামচন্দ্র নরের সহিত মৈত্রী স্থাপনের পরিবর্ত্তে বানরের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন এগুলি আমাদের দেখা অথবা তর্কের কোন দরবার নাই। পুরাণে বর্ণিত চরিত্রগুলিতে যে ঔদার্য্যের ভাবধারা ও ভক্তিরসের প্লাবন দেখা যায় তাহাই আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়। আপনি যদি কৃষ্ণ অথবা ঐরূপ কাহারও মনোহর চিত্র বর্ণনা করেন তবে আপনার বর্ণনা আদর্শের উচ্চতার উপর নির্ভর করিবে, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বিচার হইবে। কিন্তু পুরাণে বর্ণিত মহোচ্চ দার্শনিক সত্যসমূহ চিরকালই একরূপ থাকিবে। পুরাণ চর্চায় কালনিরূপণ, ইতিহাস বা কাব্য, যুক্তিবিচারের দৃষ্টি লইয়া আসিও না। ঐসব পৌরাণিক ভাবগুলি তোমার মনের ভিতর দিয়া প্রবাহের ন্যায় চলিয়া যাউক (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী)।

হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ—তন্ত্র

তন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ—শাস্ত্র, যেমন কপিলতন্ত্র। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের শাসনে বৈদিক যাগযজ্ঞ সকল লোপ পাইলে রাজভয়ে কেহ আর প্রাণী হিংসা করিতে পারিত না। কিন্তু অবশেষে বৌদ্ধদের ভিতরেই সেই যাগযজ্ঞের ভাল ভাল অংশগুলি গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, তাহা হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি। তবে বামাচার প্রভৃতি কতকগুলি ঘৃণ্য ব্যাপার বাদ দিলে—লোকে যতটা ভাবে উহা ততটা খারাপ নহে। বাস্তবিক বেদের ব্রাহ্মণভাগই (কর্ম্মকাণ্ড) একটু পরিবর্তিত হইয়া তন্ত্রের মধ্যে বর্তমান। আজকালকার সমুদয় উপাসনা, পূজা-পদ্ধতি, দীক্ষা প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড তন্ত্রমতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আত্মাকে হিন্দুরা চিরকাল মন হইতে পৃথক বস্তু বলিয়া জানিতেন।

পাশ্চাত্ত্যেরা কিন্তু মনের উপর আর উঠিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্যগণ জগৎকে আনন্দপূর্ণ এবং সম্ভোগ করিবার জিনিস বলিয়া জানেন; আর প্রাচ্যগণের ধারণা জন্ম হইতে—সংসার দুঃখপূর্ণ, উহা কিছুই নয়। এইজন্য পাশ্চাত্যেরা যেমন সংঘবদ্ধ কর্ম্মে পটু, প্রাচ্যেরা তেমনটি অন্তর্জগতের অন্বেষণে অতিশয় সাহসী।

শাস্ত্র কি?

মানুষের মধ্যে যে পশুর ভাব, আসুরিক ভাব আছে সেগুলি দূর করিয়া দিয়া আত্মার উৎকর্ষতা লাভের উপায় মনীষিগণ যুগ যুগ ধরিয়া সেই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছেন এবং যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই শাস্ত্র নামে অভিহিত।

কোন্ উচ্চতর পন্থা অবলম্বন করিলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহারা আবিষ্কার করিয়া শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেশাচার লোকাচার কুলাচার এগুলির ভিতর ভালমন্দ যাহাই থাকুক্ না কেন, এগুলি লিপিবদ্ধ থাকিলেও শাস্ত্র নহে; কারণ, এগুলি মনীষিদিগের তপস্যালব্ধ জ্ঞানের ফলশ্রুতি নহে। ঈশ্বরানুভূতি, অভিজ্ঞতা ও স্থিরবুদ্ধি দ্বারা যে জ্ঞান ও শিক্ষা লিপিবদ্ধ হয় তাহাই শাস্ত্র। জাতির পক্ষে যাহা তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আদর্শ লিপিবদ্ধ হয় তাহাই শাস্ত্র। সামাজিক প্রথার যেরূপ পরিবর্তন হয়, দেশ কাল পাত্র ভেদে শাস্ত্রেরও পরিবর্তন হয়। দ্বাপর যুগে যজ্ঞ ইত্যাদি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রবণতা ছিল। বর্তমান যুগে সেগুলি লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। সমাজ হইতেই ধর্মরক্ষা হয়, সেই সমাজে যাহাতে বিশৃঙ্খলা না ঘটে তজ্জন্য শাস্ত্রবিধি। যতদিন না মনে দৃঢ়ভক্তি জন্মে, ততদিন শাস্ত্রের প্রয়োজন। মন সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিলে, ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত হইলে শাস্ত্রের আর প্রয়োজন হয় না, যেরূপ সমস্তদেশ প্লাবিত হইলে কূপের আর প্রয়োজন হয় না।

শাস্ত্র অজ্ঞান দূর করিতে সাহায্য করিতে পারে মাত্র, কিন্তু দূর

করিয়া দেওয়ার শক্তি দিতে পারে না। কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি বা সত্য নয়, কোন্ কর্মটা করণীয়, কোন্‌টা বা করণীয় নয়, তাহার নিরূপণে শাস্ত্র প্রমাণ স্বরূপ।

শাস্ত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়া দিতে পারে, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অর্থাৎ যাহা কিছু আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে সবই ব্রহ্ম; কিন্তু এই সমজ্ঞানশক্তি অন্তরে জন্মাইয়া দিতে পারে না। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বর্ণমালা মুখস্থ করাইয়া দিতে পারেন কিন্তু বর্ণগুলি চিনিবার শক্তি তাহাদিগকে দিতে পারেন না। ধর্ম প্রচারকেরা ধর্ম প্রচার করিতে পারেন কিন্তু ধর্ম দিতে পারেন না।

জ্ঞানী পুরুষদিগের প্রদর্শিত যে সংযমমার্গ, জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহাই শাস্ত্র। শাস্ত্রে অধিকার ভেদে নানাপ্রকার ক্রিয়ার উল্লেখ আছে; ক্রিয়াগুলি পরস্পর যোগসূত্রে গাঁথা; এগুলি চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সংযম ইত্যাদির উপায় স্বরূপ, জ্ঞানলাভের সোপান মাত্র। কুম্ভকার যেরূপ চক্র ও দণ্ডের সাহায্যে মৃৎপাত্র নির্মাণ করে তদ্রূপ সুশৃঙ্খল কর্ম প্রণালী অনুসরণ করিয়া কর্ম করাই শাস্ত্রবিধি।

"শিষ্যতে, অনুশিষ্যতে বোধ্যতে অনেন অজ্ঞাতোঽর্থঃ ইতি শাস্ত্রম্"। অর্থাৎ যাহাদ্বারা ধর্মাধর্ম ও মোক্ষ প্রভৃতি অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান হয়—তাহাই শাস্ত্র। বেদ ও বেদমূলক স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি শাস্ত্র। (ছান্দোগ্য উপনিষদ)।

"নানাশাস্ত্র পঠেল্লোকা নানাদৈবত পূজনং।
আত্মজ্ঞানং বিনা পার্থ! সর্ব্বকর্ম নিরর্থকম্।"

আধ্যাত্মিক ও মানবিকতায় ভারতবর্ষ একদিন জগতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন, স্মৃতি, কাব্য, পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলি যদি না থাকিত, তবে হয়তো বা এতদিনে ভারতবাসীরা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত।

মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে ; কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয় ও হৃদয়হীন হইয়া পড়িয়াছি। নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না (বিবেকানন্দ)।

গায়ত্রী মন্ত্র ও ব্যাখ্যা

গৈ+ঘঞ্=গায়। গায়েন (গানেন) ত্রায়তে (রক্ষতি) ইতি গায়ৎ+ত্রৈ+ক কর্ত্তৃবাচ্যে ঈপ্=গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যংভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

অর্থ :—

১। ওঁ=(অ+উ+ম্)=ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

২। ভূঃ=পৃথিবী। ভুবঃ=অন্তরীক্ষ, আকাশ। স্বঃ=স্বর্গ। ভূর্ভুবঃ স্বঃ=ত্রিভুবন।

৩। তৎ=তস্য।

৪। সবিতুঃ=প্রসবিতুঃ সর্ব্বভূতানাম্ প্রসবিতুঃ অর্থাৎ ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থই যাঁহার মূর্ত্তির প্রতীক।

৫। বরেণ্যং=(উচ্চারণ-বরেণীয়ং)=উপাসনীয়ং অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-ভয় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য যিনি প্রার্থনীয়।

৬। ভর্গঃ=তেজ। দেবস্য=দেবতার।

৭। ধীমহি=ধ্যান করি চিন্তা করি।

৮। ধিয়ঃ=বুদ্ধি। যঃ=যিনি। নঃ=আমাদের। প্রচোদয়াৎ-প্রেরয়তি। ধিয়ঃ যঃ নঃ প্রচোদয়াৎ=ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ লাভের জন্য যিনি আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ করেন, পরিচালনা করেন।

গায়ত্রীর সারাংশ ব্যাখ্যা এইরূপ—যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপ ধারণ করেন ; ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থই

যাঁহার মূর্ত্তি ; যিনি জন্ম, মৃত্যু ভয়, এই ত্রিবিধতাপ শান্তির জন্য ও সংসার হইতে নিস্তার লাভের জন্য প্রার্থনীয় এবং যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ বিষয়ে পরিচালনা করিতেছেন—সেই দেব সবিতার অর্থাৎ জগৎ নির্ম্মাণাদিরূপ ক্রিয়াশীল পরমেশ্বরের তেজ আমি ধ্যান করি চিন্তা করি (ধীমহি)।

টীকা—ধিয়ো যো নঃ—ইহা প্রকৃত পক্ষে—ধিয়ো যো নঃ কিন্তু এই য এর উচ্চারণে নিম্নলিখিত বিধি নিষেধ থাকায় য স্থলে য় উচ্চারণ করিতে হইবে ; অর্থাৎ ধিয়ো যো নঃ স্থলে ধিয়োয়োনঃ পাঠ বলিতে হইবে। অন্তঃস্থ য কারের সংস্কৃত প্রকৃত উচ্চারণ সর্ব্বত্র—য়। পরন্তু যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষায় সংস্কৃত বচনে যাহা আছে তাহার ভাবার্থ এই যে, যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রে-পাদের আদিতে, পদের আদিতে, সংযোগ ও সমাসান্তর্গত পদচ্ছেদের আদিতে য কারের উচ্চারণ—"জ" অন্যত্র—য়। কিন্তু মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে তৃতীয় পটলে গায়ত্রী সম্বন্ধে—"অন্ত্য য-কারয়ো স্থানে ষ ইতি চ যঃ পঠেৎ, স চণ্ডাল ইতি খ্যাতো ব্রহ্মহত্যা দিনে দিনে" এই বিশেষ বচন থাকায় য়োনঃ অর্থাৎ ধিয়ো য়োনঃ পাঠই কর্ত্তব্য।

গায়ত্রীতে ২৪টি অক্ষর আছে।

গ্রন্থকারের প্রার্থনা

ন ধনং ন জনং ন চ প্রসিদ্ধিং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

অর্থাৎ হে করুণাময় জগদীশ্বর ! আমি ধন চাইনা, জন চাইনা, খ্যাতি পাণ্ডিত্য কিছুই চাইনা। আমার একমাত্র কামনা—জন্মে জন্মে যেন তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ

সমাপ্ত